বিবিধ।

বৈশেষিক দর্শন কণাদ ঋষিকৃত। এই মহর্ষি কাশ্যপ গোত্রে জন্মিয়া ছিলেন। ইহাঁর অপর নাম উলূক। এই জন্য বৈশেষিক দর্শনকে ঔলূক্য দর্শন বলে। উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ ধান্যের এক এক কণা সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এ জন্য এই ঋষির নাম কণাদ।

এই ঋষি অতি প্রাচীন। মহাভারতে ইহাঁর উল্লেখ আছে। সাংখ্য-দর্শনের একটী সূত্রে বৈশেষিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় সুতরাং ইহা সাংখ্য অপেক্ষা প্রাচীন। বেদান্তের অণুবাদখণ্ডন দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহা তদপেক্ষা প্রাচীন। শব্দের উৎপত্তি বিনাশবত্ত্বা এই দর্শনের সিদ্ধান্ত কিন্তু জৈমিনি অতি যত্নে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন সুতরাং ইহা তদপেক্ষা যে প্রাচীন যে বিষয়েও সন্দেহ নাই। আর ইহা ন্যায় দর্শন অপেক্ষা যে প্রাচীন তাহারও প্রমাণ আছে। বৈশেষিকে অনুমান প্রণালী সংক্ষেপে কিন্তু ন্যায়ে সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। আর একটী প্রমাণ এই বৈশেষিকে তিনটী হেত্বাভাস গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়ে পাঁচটী স্বীকৃত দেখা যায়। এস্থলে অনুমান করিতে হইবে যদি ন্যায় দর্শনের পরে ইহা রচিত হইত তাহা হইলে পঞ্চ হেত্বাভাস স্থলে কেন যে তিনটী মাত্র স্বীকৃত হইতেছে তাহার হেতু প্রদর্শন অবশ্যই ইহাতে থাকা সম্ভব। কিন্তু তাহা নাই। ইহাতেও বুঝা যায় বৈশেষিক ন্যায়েরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ফলত ইহা অতি প্রাচীন দর্শন। ইহার প্রাচীনতার আরও একটু প্রমাণ এই যে অন্যান্য দর্শনের সূত্র সকল যেরূপ দুর্বোধ ইহা সেরূপ নহে। ইহার সূত্র সকল অতি সরল। পাঠ মাত্রেই তাহার অর্থগ্রহ হইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ যাহা অপর দর্শনে স্বীকার করে না ইহা তাহা স্বীকার করে বলিয়া ইহার নাম বৈশেষিক।

ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম।

(১) আত্মার সাংসারিক সুখ দুঃখ বোধ ম্লান করা কর্ত্তব্য। যত আত্মার সাংসারিক সাড় কমিবে তত আধ্যাত্মিক সাড় (ব্রহ্মানন্দ) বাড়িবে।

"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"।
"ব্রহ্ম সংস্পর্শং অত্যন্ত সুখমশ্নুতে"।

(২) বাহ্য জগৎ, শরীর ও মনকে অনাত্মীয় বলিয়া ঝেড়ে ফেলা এবং আমি কেবল আত্মা মনে করা এবং আত্মাতে ও আত্মার আত্মাতে সংস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই ঝেড়ে ফেলা প্রণালী গীতা হইতে বিলক্ষণ শিক্ষা করা যায়। বৌদ্ধ যোগীরা কেবল আত্মাতে সংস্থিত হইতেন। ঋষিরা আত্মার আত্মাতে সংস্থিত হইতেন। "উপাস্যং তৎপরং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"। এই সর্ব্বোত্তম যোগ।

(৩) কর্ম্ম ও যোগের সামঞ্জস্য। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করার প্রধান লক্ষণ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ন ফলেষু কদাচন"।

(৪) জ্ঞান ও ভক্তি ওকর্ম্মের সামঞ্জস্য।

পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমেতৎ

বিগত ১৬ই ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীমন্মহর্ষি মহাশয়ের ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যে পত্র বাহির হয় তৎপাঠে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ক মত যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম—তদতিরিক্ত অনেক মত

তাঁহার সহিত বিশেষ আলাপে জানিতে পারিয়াছি এবং তাঁহার প্রচারকার্য্য বা দীক্ষাপ্রণালী স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি "জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার" করিতেছেন কি কি করিতেছেন আপনারা তাহার বিচার করুন এবং তাঁহার অবলম্বিত প্রচারপ্রণালীই যদ্যপি প্রকৃত 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার' হয়, তবে আপনারাও সেই "ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ" অবলম্বন করুন।

১। গোস্বামী মহাশয় কাহার বুদ্ধিভেদ ঘটান না। তিনি বলেন একজন লোক যদ্যপি অশ্বকে ঈশ্বরবোধে, আবার তাহার সেই ঈশ্বর নরবলিতে সন্তুষ্ট হয় এই জ্ঞানে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে নরবলি দিয়া পূজা করে, তবে তাহাকেও তিনি প্রথমে সেই অশ্বরূপেই দর্শন দিয়া ক্রমে অজ্ঞানতা দূর করিয়া প্রকৃত রূপ দর্শন দিবেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপের অন্যথা করিয়া ভক্তের কল্পিত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ ধ্বংসও স্বীকার করিয়া থাকেন।

২। সমস্ত দেব দেবীর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন—তাহাদের আবার স্বতন্ত্র বাসস্থান বা লোক আছে, তাহাও বলেন, ইহাও বলেন যে, যে যাঁহার উপাসক, তিনি তাহাকে সেই রূপে দর্শন দিয়া ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবেন, তাহার পরমার্থ পথে সহায় হইবেন। তিনি স্বয়ং নৃসিংহ অবতার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রকাশ করেন।

৩। তিনি অতি গোপনে লোককে দীক্ষিত করেন—যে তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত নহে, সে সেস্থানে থাকিতে পারে না—দীক্ষিত করার সময় তাঁহাকে তাঁহার গুরুদেবের অনুমতি লইতে হয়—গুরুদেব সেই সময় স্থূলদেহে বা সূক্ষ্মদেহে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি করেন। কোন্ নাম বা বীজ মন্ত্রের কে অধিকারী তাহাও তিনিই বলিয়াদেন। গুরুদেবই গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারায় মন্ত্র দেন। তাঁহার নিজের মন্ত্র দেওয়ার শক্তি এখনও জন্মে নাই। তাঁহার শরীর ভগ্ন সেই জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহার শরীর হইতে আত্মাকে (সূক্ষ্মদেহকে) বাহির করাইয়া তাহার দ্বারায় মন্ত্র দেওয়ান। ঈশ্বরবিশ্বাসী হইলেই তাঁহার অবলম্বিত সাধনের অধিকারী স্বাব্যস্ত হয়।

৪। গোস্বামী মহাশয়ের সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহাকে স্বধর্ম্ম ছাড়িতে হয় না। একজন শাক্ত তাহার পূর্ব্ব পূজাপদ্ধতি ঠিক রাখিয়া তাঁহার মতে সাধন ভজন করিতে পারে। কাহাকেও তিনি স্বধর্ম্ম ছাড়িতে উপদেশও করেন না। সাধন প্রভাবে মন্ত্রশক্তিতে কালে তাহার ভ্রম দূর হইবে এই কথা বলেন।

৫। তাঁহার একজন লেখা পড়া না জানা শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি তাহাকে মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। সে মন্ত্রের বা নামের অর্থও জানে না।

৬। মন্ত্র প্রদান কালে শিষ্যকে কতকগুলি নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হয়—কাহাকে এই এই কর্ম্ম করিও না উপদেশ দেওয়া হয়—কাহাকেও বা যখন যে কার্য্যে পাপ বোধ হইবে, তখন সেই কার্য্য করিতে বিরত হইও বলা হয়। উপদেশের মধ্যে সাধনের বিঘ্ন হইতে দেখিলে গুরুচিন্তা করার উপদেশও দেওয়া হয়। গুরুচিন্তা করিলে গুরু যেখানে থাকুন উপস্থিত হইয়া সাধনে সহায়তা করিয়া থাকেন।

৭। তাঁহার মন্ত্রশিষ্যগণের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য তিনি নিজে দায়ী। যতটি লোককে তিনি দীক্ষিত করিবেন যে কাল পর্য্যন্ত তাহাদের সকলের সদ্গতি না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহারও উদ্ধার নাই। শিষ্যদের মুক্তির জন্য তাঁহাকে পুনর্জ্জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে যে কেহ যে দণ্ডে যে পাপ কার্য্য করিবে, সেই দণ্ডেই সেই পাপের ছবি (ফটোগ্রাফের ন্যায়) গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া যে কোন পাপকর কার্য্য করিবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা জানিতে পারেন।

৯। মন্ত্রপ্রদানকালে যে শক্তি প্রদান করা হয় শিষ্য কোন প্রকার পাপকর কার্য্য করিলে তিনি বা তাহার গুরুদেব বা অন্যান্য মহা পুরুষ সেই শক্তি অলক্ষিত ভাবে হরণ করিয়া লয়েন। শিষ্য সে প্রাণায়াম প্রক্রিয়াটি ভুলে না বা মন্ত্রটিও বিস্মৃত হয় না—অথচ সাধনের যে ফল তাহা লাভ করিতে পারে না। সে যদি পাপানুষ্ঠান ছাড়েও, তথাপি সেই শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে সে মন্ত্রজপে বা প্রাণায়ামে কিছুই ফল পাইতে পারে না।

১০। তিনি কোন সমাজ বিশেষের অধীনতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন তিনি হিন্দুর তিনি মুসলমানের তিনি খৃষ্টানের তিনি ব্রাহ্মের; তিনি ছাগশোণিতপ্লাবিত দেবীমন্দিরকে যে চক্ষুতে দেখেন ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরকেও সেই সেই চক্ষুতে দেখেন। তিনি আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন না। তাঁহার অবলম্বিত পথই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এই তো কতকগুলি তাঁহার প্রধান মত বা প্রচার

প্রণালী। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত আছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগাবলম্বনে যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি মনুষ্যের জন্মে তাহারই কয়েকটি নূতন নূতন বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

এই যোগপথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরদর্শনতো হইবেই তাহা ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞতা ভূত ভবিষ্যত ঘটনার জ্ঞান প্রাপ্তি—এখান হইতে অতিদূর দেশের নিভৃত কক্ষে কি হইতেছে, তাহা জানা, সূক্ষ্ম বা স্থূলদেহে দূর প্রদেশে গমন,এমন কি চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে গমন শক্তিও জন্মে। ইহলোকস্থিত দূরদেশবাসী মহাপুরুষদের স্থূলদেহেই পলকের মধ্যে একত্রিত হওয়া, পরলোকগত আত্মার সন্দর্শন, মৃত শরীরে যোগীর আত্মার প্রবেশ ও শবকে জাগ্রত করা এবং এক কথায় বহু বৎসরের কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য করা ইত্যাদি কত কি অদ্ভুত শক্তি লাভ।

শ্রীঅনাথবন্ধু রায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৯ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৵১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাকমাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

আগামী ৯ই আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইবে।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ ১লা আষাঢ় ১৮১০ শক। } শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪০ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ভবানীপুর ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় শুক্রবার ১৮১০ শক।

উদ্বোধন।

আমরা ক্ষুদ্র—পৃথিবীর ধূলিকণা হইয়া কি প্রকারে সেই মহান্ অসীম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা পাতা অনুপমমহিম ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই? কি প্রকারে আমরা আত্মাতে তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার প্রতি মনঃ প্রাণ সমাধান করিতে সমর্থ হই? ইহার কারণ কি ইহাই নয়, যে যেমন মধুমক্ষিকারা কোথায় মকরন্দ আছে সংস্কারবশতঃ তাহা জানিতে পারিয়া তদ্‌যুক্ত পুষ্পের প্রতি ধাবিত হয়, আমরাও সেইরূপ আত্মনিহিত সংস্কার ও বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করি ও তাঁহাকে আত্মাতে পাইয়া ভক্তি ও প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করি। "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" তিনিই দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার, সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার, তাঁহাকে ভজন সাধন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। যে আত্মা প্রকৃতিস্থ, সে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সতত উন্মুখ থাকে। বিষয়-সুখ ধন মান পৃথিবীর মহোচ্চ সম্পদ্ আত্মাকে কদাচ পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, বৃহৎকায় তিমি মৎস্য কি ক্ষুদ্র তড়াগে বিচরণ করিতে পারে? পরমেশ্বরই আমাদিগের পরম ধন, পরম আনন্দ ও পরম সম্পদ্। তাঁহাকে লাভ করিলে যে তৃপ্তি যে আনন্দ যে শান্তি লাভ করা যায়, তাহা পৃথিবীর কোন বস্তুই প্রদান করিতে পারে না। যে সকল প্রশান্তচেতা সাধুরা ঈশ্বরকে জীবনের মধ্য বিন্দু করিয়া তাঁহার উদ্দেশে আপনাদিগের চিন্তা ও কার্য্য নিয়োগ করেন, তাঁহারাই ধন্য। ভাগবতে* আছে যে, যে সকল মুনি আত্মারাম, অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরেতে নিরন্তর রমণ করেন, তত্ত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হওয়াতে যাঁহারা গ্রন্থের বহির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের মধুময় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অহেতুকী

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ॥১।৭।১০

ভক্তি করেন, যেহেতু তাঁহার প্রতি ভক্তি-যোগ "অনর্থোপশমম্," সকল অনর্থের প্রশমন, সে ভক্তি থাকিলে আর সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। অতএব যাঁহাদিগের গতি মতি ঈশ্বরে দৃঢ় হয় নাই, বিষয়-কামনা হইতে পাপ প্রলোভন হইতে যাঁহারদিগের চিত্ত এখনও বিমুক্ত হয় নাই, তাঁহারা একান্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে, তাঁহার পথের পথিক হইতে, কায়-মনে উদ্যুক্ত হউন, তদ্ভিন্ন শ্রেয়োলাভের আর সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর এমনি দয়াময় যে পাপ তাপে তাপিত ব্যক্তি যদি পাপ জন্য অনুতাপ করিয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করে, তিনি তাহার পাপ-ভার হরণ করেন, তাহাকে শুভমতি প্রদান করেন, তাহাকে নব জীবন দিয়া কৃতার্থ করেন। তিনি সাধু অসাধু সকলকেই আপনার মঙ্গল ছায়া দান করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। অতএব আইস, মঙ্গল যাঁহার নাম, মঙ্গল যাঁহার কার্য্য, যাঁহার উপাসনা অশেষ মঙ্গলের নিদান, সেই উপাসনাতে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হই।

উপদেশ।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

ঈশ্বর ইন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদি বহির্বিষয় প্রকাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য ইন্দ্রিয় সকল অনাত্মা শব্দাদি বিষয়ই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।

এই কাঠশ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ঈশ্বরে নিবৃত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক ইন্দ্রিয়ের এই দুই প্রকার প্রবৃত্তিকে রূপকচ্ছলে দেবতা ও অসুররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাক্ চক্ষু মন প্রভৃতির শাস্ত্রনিয়মিত কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহা দেবতা এবং উহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহা অসুর। এই দেবাসুর যুদ্ধে অসুরেরা দেবতাকে পরাভব করে, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদ্ভবে অসুরের জয়লাভ হয়। অসুরের জয়ে জীবের পাপে প্রবৃত্তি ও নরকাদি দুর্গতি হইয়া থাকে। আবার যখন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় তখন স্বাভাবিক আসুরী বৃত্তির অভিভবে দেবতার জয় হইয়া থাকে। ইহাতে জীবের শুভ কর্ম্মের বাহুল্য ও সদ্গতি হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটী অযত্নসিদ্ধ ও অপরটী যত্নসিদ্ধ, সুতরাং অসুরেরই জয় অবশ্যভাবী হইয়া উঠিল।

পরে দেবতারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে তাঁহারা পক্ষপাত ও অভিমানাদি শূন্য উদ্গাতা ও ঋত্বিককে আশ্রয় করিয়া অসুরগণকে পরাভব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ঐ ইন্দ্রিয় উদ্গাতৃকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাক্যকথনরূপ কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ উপকার নিষ্পন্ন করিল বটে কিন্তু যাহা তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণোচ্চারণ তাহা স্বপক্ষে সম্পন্ন হওয়াতে সে তদ্বিষয়ে অভিমানী ও আসক্ত হইল। ফলত এই অভিমান ও আসক্তি দ্বারা অসুরেরা তাহাকে জানিতে পারিয়া তাহাকে নষ্ট করিল। এইরূপে অভিমান ও আসক্তি-দোষে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হইয়া গেল। পরিশেষে সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ মন আসিয়া ঋত্বিকের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কিন্তু তাঁহারও

স্বপক্ষে শোভন সঙ্কল্পে অভিমান উপস্থিত হইল। তিনিও ঐরূপে নষ্ট হইলেন।

বৃহদারণ্যকের এই রূপক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে অভিমান ও আসক্তিই জীবের বিনাশের নিদান। যতকাল এই দুইটী থাকিবে তাবৎ জীবের বৈরাগ্য ও তন্নিবন্ধন ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না। এবং তদভাবে তাহার মুক্তিও দুর্লভ হইয়া থাকে। কিন্তু পরম কারুণিক ঋষিরা এই অভিমান ও আসক্তি ত্যাগ হইবার জন্য অধিকারভেদে নানা উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধানত দর্শনের অভিপ্রায় কিরূপ তাহার আলোচনা আবশ্যক। বেদান্ত দর্শন কহিলেন এই সংসার ভ্রমকল্পিত, ইহার বাস্তবিক সত্তা নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সমস্তই ব্রহ্ম, পারমার্থিক সত্ত্বা কেবল তাঁহারই। যাহা সত্য প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই সত্তা, তিনিই ব্রহ্ম। আর এই নামরূপাত্মক বিকার অসত্য, ইহার সমস্ত ব্যবহার যথাযথ নিস্পত্তি হইলেও জ্ঞানোদয়ে অর্থাৎ অবিদ্যার নাশে ইহার সত্তা তোমার নিকট লোপ পাইবে। বেদান্তের এই যে সংসার সম্বন্ধে পারমার্থিক সত্তার লোপ ও ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার ইহার হেতু এই যে জীবের ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এত প্রবল যে সংসারের অণুমাত্র বীজ থাকিলে তাহার ভোক্তৃভোগ্য ব্যবহার অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে সংসারী করিয়া ফেলিবে এবং তাহার বৈরাগ্য দুর্ঘট হইয়া পড়িবে। ফলত বৈরাগ্য সহজ হইবার নিমিত্তই সংসারের পারমার্থিক সত্তার লোপ স্বীকৃত হইয়াছে। নতুবা আমার অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞানোদয় হইলে সংসারের যথাযথ ব্যবহার সম্পন্ন হইবে কিন্তু ইহার বাস্তবিক সত্তা আমার চক্ষে আর নাই এ কথার কোন আর অর্থ থাকে না। কঠ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়কে বহির্বিষয় প্রকাশের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং বিষয়ে বিচরণ তাহার স্বভাব কিন্তু এই স্বভাবই তাহার তত্ত্বদৃষ্টির ব্যাঘাতক, অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টি তাহার পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিষয়ের গুরুতর আকর্ষণ বিনা আয়াসে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইতে দেয় না। সুতরাং যাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য তাহাতে জীবের সহজে মতি হইবে না। অথচ তাহার মুক্তি চাই। আবার মুক্তি বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করে। এই জন্য বৈদান্তিক বলিলেন এই যে সম্মুখে বিশাল সংসার দেখিতেছ ইহা মায়া মরীচিকা। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোন পদার্থ নাই। যাই এই জ্ঞানাগ্নি জীবে প্রবেশ করে তখন সে সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মেরই স্ফূর্ত্তি দেখিতে পায়। বিষয় তো তখন তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছে আর তাহার আকর্ষণ কোথায়? তখন সে পরম বৈরাগ্যে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠে

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

বেদান্তজ্ঞান আবার কহিলেন যখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই তখন কি তুমি জ্ঞানে আর তোমার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতে পার? এই স্থানে জীবের অহঙ্কার এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। তখন সে, যে কোন কার্য্য করে রূপকে প্রদর্শিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সেই সকল কার্য্যে আর তাহার অভিমান ও আসক্তি থাকে না। বাস্তবিকই সে তখন জ্ঞানে আপনার অনস্তিত্ব অনুভব করে। এ অনস্তিত্ব কিরূপ? যেমন জ্যোতিঃ

পুঞ্জ সূর্য্যের নিকট একটা খদ্যোতের অ-স্তিত্ব। এই অস্তিত্ব একপ্রকার অনস্তিত্বই বলিতে হইবে। ফলত যত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা যায় ততই বোধ হয় যে জীবের বিষয়ে অনাসক্তি ও অভিমান ত্যা-গের জন্যই এই বৈদান্তিক মায়াবাদের সৃষ্টি। বাস্তবিক পক্ষে এই জীব সর্ব্ব-জ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মও হন না এবং এই সংসারও একটা অলীক পদার্থ নয়। অভিমান নষ্ট করিয়া পর বৈরাগ্যে আনয়ন এই পরম জ্ঞানের গূঢ় উদ্দেশ্য। বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত ব্রহ্মে ভক্তি হয় না, আবার ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই সুতরাং জ্ঞানই মুক্তির নিদান। বেদান্ত সেই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন।

আবার গীতার আলোচনায় এই কথা-রই প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা কহিলেন কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্ম্মে তোমার অধিকার ফলে অধিকার নাই। এইটী গীতার নিস্কাম কর্ম্মের উপদেশ। যে ঘোর সংসারী তা-হারই কামনা হয় কিন্তু যে ত্রিবিধ তাপে উত্তপ্ত হইয়া তত্ত্বালোচনায় সংসারের অলী-কত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহার আর সং-সার ভোগের কামনা থাকে না। ফলত নিস্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারাই জীবের বৈরাগ্য সিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিই কামনার অধিষ্ঠান। যতক্ষণ অভিমান থাকে তাবৎ কামনাও থাকে। এই অভিমান নাশের উপায় ইন্দ্রিয়দমন অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সঞ্চরণ। এই অনাসক্তি বৈরাগ্য ব্যতীত সম্ভবে না।

> ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে
> এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং।
> তস্মাত্ত্বং ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ
> পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং।

এই সমস্ত ও অন্যান্য শ্লোকে জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক কামনা ত্যাগের কথা গী-তায় পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। গীতার মুখ্য কথা এই তোমার ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিচরণ করুক কিন্তু বিষয়ে আসক্তি যাহা তোমার তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ ব্যাঘাতক সেই টুকু তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ তুমি যদি নিস্কাম হইয়া কর্ম্ম কর তাহা হইলে তুমি আসক্তিশূন্য হইলে। এই আসক্তিশূন্যতাই বৈরাগ্য। দর্শন-কার সংসারের নাস্তিত্ব দেখাইয়া এবং জীবের অহঙ্কার বা আমি ও আমার বুদ্ধি লোপ করাইয়া মনে একটী প্রবল বৈরা-গ্যের উদয় করিয়া দিতেছেন। স্মৃতিকার এক নিস্কাম কর্ম্মের উপদেশে তাহাই ক-রিতেছেন। ফলত ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ে অনাসক্ত করাই ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বসোপান। উপনিষদ, দর্শন ও গীতা বেদান্তের এই ত্রি-বিধ প্রস্থানই ব্রহ্মলাভের জন্য এক বাক্যে ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়ে অনাসক্তি বা বৈরা-গ্যের উপদেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মলাভ আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের অন্তরে নিরন্তর দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শাস্ত্রালোচনায় আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে এই অসুর নিপাত করিতে না পারিলে আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধি হইবে না। যতক্ষণ অভিমান ও আসক্তি না যায় তাবৎ অসুরের জয়। ঈশ্বর আমা-দের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও তাহার বিষয় দিয়াছেন। অভিমানশূন্য হইয়া অনা-সক্ত ভাবে বিষয়ে বিচরণ কর অসুর নিপাত হইবে। দেখ আমরা স্বাধীন নহি। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশে কার্য্য করে সেই রূপ আমরা ঈশ্বরের আদেশে তাঁর সংসারে তাঁহারই কার্য্য করিতে আসিয়াছি। তবে প্রত্যেক কার্য্যে আমরা আপনাকে কেন

প্রতিবিম্বিত দেখি। ব্রহ্মের কার্য্য করিতে আসিয়াছ তাঁহার কার্য্য কর। ফলের প্রতি লক্ষ্য করিও না। ফল ফলদাতার হস্তে। ফলত কামনাই সর্ব্বনাশের মূল। সকল শাস্ত্র একবাক্যে তাহাই কহিয়াছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বাক্যামৃতকণা।

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি।
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নরাণাং।
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাং॥

* * *

পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম
নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য॥
আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানাং
অন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়াদ্য॥
মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং।
ন জায়তে বৈ পরমাত্মসঙ্গি॥

* * *

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ॥

বিষ্ণু পুরাণং।

অযুত বৎসরেই হউক আর লক্ষ বৎসরেই হউক বাসনারাশির সমাপ্তি নাই। বার বার পূর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার মনুষ্যগণের বাসনারাশির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপত্তি হয়। * * *

যে স্থানে এক বাসনার পরিপূরণ সেই স্থানেই যে অপর বাসনার জন্ম তাহা কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে? ইহা মৎকর্ত্তৃক অদ্য বিদিত হইল যে দেহের অন্ত হইলেও বাসনার অন্ত নাই এবং বাসনা বিষয়াসক্তির বশ যে পুরুষ তাহার চিত্ত কখন পরমাত্মায় অভিনিবিষ্ট হয় না।

* * *

নিঃসঙ্গতাই যতিদিগের মুক্তিপদ এবং সঙ্গ হইতে অশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। সঙ্গ হেতু যোগারূঢ় যোগীও অধঃপতিত হয়েন, অল্প মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে যে পুরুষের তাহার আর কি কথা।*

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ভগবদ্গীতা।

শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কে মনে মনে আলোচনা করে যে পুরুষ তাহার সেই বিষয়ে প্রীতি জন্মায়, প্রীতি হইতে সেই বিষয়কে পাইবার ইচ্ছাস্বরূপ যে কাম তাহার উৎপত্তি হয়। কাম হইতে (তাহার প্রতিঘাত হেতুক) ক্রোধ সমুৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে বিভ্রম জন্মায়। উক্ত বিভ্রম হইতে পূর্ব্বোদিত-শুভবুদ্ধির সংস্কারজনিত যে স্মৃতি তাহা ভ্রষ্ট হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইতে অন্তঃকরণের কার্য্যাকার্য্য বিবিক্ত করিবার শক্তি নষ্ট হয় এবং এইরূপ বুদ্ধিনাশ হইতে পুরুষ পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুতিরূপ যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু তাহাকে প্রাপ্ত হয়।

কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ ত্বং হি জায়সে।
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িস্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি॥

মহাভারতং।

হে কাম তোমার মূল আমি অবগত হইয়াছি; তুমি সঙ্কল্প হইতে জন্মগ্রহণ কর ইহা নিশ্চিত। তোমাকে সঙ্কল্প ক-

---

* অনুপস্থিত অনুকূল বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছা বাসনার্থ। এবং উপস্থিত অনুকূল বিষয়কে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছার নাম আসক্তি। অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নাই এই রূপ নিঃসংশয় জ্ঞানের নাম নিঃসঙ্গতা। পরমেশ্বরকে ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেননা তিনি নিজের স্বভাবেই অযত্নে আমাদের হৃদয়ে চির উদিত। এই জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে তিনি যোগারূঢ় যোগী।

রিব না সেই নিমিত্ত তুমি আমার সম্বন্ধে ঘটিবে না।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

মণ্ডুকাদি শ্রুতিঃ।

আমার ও সর্ব্বজগতের অন্তর্যামী যিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে জীবের সমুদায় কর্ম্মরাশি ক্ষয় হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং হৃদয়ের গ্রন্থি স্বরূপ যে কাম তাহাও ভিন্ন হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিনী ললিত—তাল একতালা।

আমি ডাকি হে কাতরে বড় ব্যাকুল আছে মন
কেমনে তোমারে পাই বল পিতা বল তাই
আর কিছু নাহি চাই তোমারি ভিখারী যে
যে তোমারে চায় তুমি রাখ তারে পায়
আমি আসিয়াছি দীনহীন লইতে শরণ
সদা অজ্ঞান তিমিরে কেন আছি প'ড়ে
তোমার করুণা হিল্লোলে বিতর চেতন
এস পিতা এস কাছে প্রাণ কাঁদে তোমায় যাচে
আমার মরমবেদনা যত করি নিবেদন
আত্মবন্ধু প্রিয়জনে তুমি লইয়াছ সঙ্গোপনে
তবে কেন তোমা হ'তে করহে বঞ্চন
এখন তোমারে দাও সঙ্গে ক'রে লও
এখন দয়াময় বন্ধু পেলে জুড়াবে জীবন।

রাগিনী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

যখন জান্‌তে পেয়েছি হে তোমায় ছাড়িব না
তুমি দয়াময় তোমায় দিয়ে হৃদয়
আমি পূর্ণ করিব সব কামনা।
তোমাতে যখন হই হে মগন
কি আনন্দ পাই হৃদয়ে তখন
ভুলে যাই তাপ, দূরে যায় পাপ
কোথা চ'লে যায় অন্য বাসনা।
তোমারি আশাতে র'য়েছি বাঁচিয়ে
থাকিব তোমারি চরণ ধরিয়ে
দাও প্রেম তব হৃদয় ভরিয়ে
পাইব সান্ত্বনা।
ঘুচাও সকল ভব কোলাহল
তোমারি ভাবেতে করহে বিহ্বল
দূর ক'রে দাও হৃদয় গরল
তাহে অমৃত কর সিঞ্চন।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

জড়বস্তুর গুণ স্বতঃ কিরূপ।

জড়বস্তুর সমস্ত গুণ স্বতঃ (অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে) একান্তপক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

প্রমাণ।

জড় বস্তুর ন্যায় জড়বস্তুর গুণ-সকল স্বতঃ আশ্রয়-ভ্রষ্ট বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আশ্রয়কে না জানিয়া কোন বিষয়কেই জানা যাইতে পারে না,—প্রতীচ্য জ্ঞান ব্যতিরেকে পরাচ্য জ্ঞান সম্ভবে না। অতএব জড়বস্তুর সমস্ত গুণ স্বতঃ একান্তপক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রয়োজন ॥ ১ ॥

ভৌতিক বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান কি-প্রকার জ্ঞান—এই প্রশ্নের আন্দোলন-কালে মনোবিজ্ঞান দুইটি বিভিন্ন মতের মধ্যে দোলায়িত হয়। কখন বা মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার দলে মিশিয়া সপ্তম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের এই মত-টি অনুমোদন

করে যে, জড়বস্তু স্বতঃ জ্ঞান-গম্য; কখন বা এরূপ একটি মত ব্যক্ত করে—লৌকিক চিন্তা যাহার কোন ধারই ধারে না; সেটি এই যে, জড়বস্তু নিজে না হউক্ তাহার গুণ-সকল স্বতঃ জ্ঞান-গম্য। প্রথম মতটির সম্বন্ধে সপ্তম সিদ্ধান্ত যাহা বলিবার তাহা বলিয়া চুকিয়াছে; উক্ত সিদ্ধান্তে যা'র পর নাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জড়বস্তু স্বতঃ (অর্থাৎ জ্ঞাতার সঙ্গাশ্রয় ব্যতিরেকে) কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। দ্বিতীয় মতটি যাহা নিম্ন-লিখিত প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট-রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহার খণ্ডনার্থেই বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণা। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সপ্তমটিরই ন্যায় স্ববিরোধ-গর্ত্ত।

অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

যদিচ জড়বস্তু স্বতঃ উপলব্ধি-গম্য নহে, তথাপি জড়বস্তুর বিশেষ একজাতীয় গুণ স্বতঃ উপলব্ধি-গম্য।

জড়বস্তুর মৌলিক গুণ এবং বৈকারিক-গুণ দুয়ের প্রভেদ ॥ ৩ ॥

উপরি-উক্ত "বিশেষ এক জাতীয় গুণ" আর কিছু নয়—যে গুণ-গুলিকে মনোবিজ্ঞানীরা জড়বস্তুর মৌলিক গুণ Primary qualities বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সেই-গুলি। এই স্থানটিতেই জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই প্রকার গুণের প্রভেদ আলোচিতব্য। ঐ প্রভেদটি তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে এক সময়ে খুবই ধূমধাম করিয়াছে—কিন্তু সমস্তই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। যাহাই হো'ক্—উহা যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের ইতিবৃত্তে একটি সুব্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে, এজন্য উহার অসারতা এবং ভ্রমাত্মকতা প্রকাশ্যে বাহির করিয়া দেখানো আবশ্যক।

জড়বস্তুর বৈকারিক গুণের পরিচয়-চিহ্ন ॥ ৪ ॥

জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক গুণসকল সবিস্তরে প্রদর্শন করা অথবা তাহাদের কাহার কিরূপ প্রকৃতি তাহা বিবৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। ঐ দুই জাতীয় গুণের কাহার কিরূপ পরিচয়-চিহ্ন তাহার একটি সাধারণ আদর্শ প্রদর্শন করাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট; তাহা হইলেই পাঠক উভয়ের প্রভেদই বা কি এবং সে প্রভেদের তাৎপর্য্যই বা কি তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শৈত্য ঔষ্ণ্য বর্ণ শব্দ আস্বাদ গন্ধ—এই গুলিই বৈকারিক গুণ। এই প্রকার গুণ-বাচক শব্দগুলির অর্থ দুইরূপ। উহাদের এক অর্থ আমাদের অভ্যন্তর-স্থিত বিশেষ বিশেষ ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি, এবং উহার আর-এক অর্থ সেই সকল অনুভূতির উত্তেজক বিশেষ বিশেষ জড়বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ। উত্তাপ অথবা বর্ণ বলিতে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত অনুভূতি-বিশেষও বুঝায় আর সেই অনুভূতির উৎপাদক ভৌতিক কারণ বিশেষও বুঝায়। উত্তাপ আমাদের শরীরে এবং উত্তাপ অগ্নিতে, এ দুই কথার অর্থ দুই প্রকার। শরীরের বেলায় তাহার অর্থ এক প্রকার স্পর্শানুভব—অগ্নির বেলায় তাহার অর্থ এক প্রকার ভৌতিক গুণ যাহা সেই স্পর্শানুভবের কারণ। এইরূপ, বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দ যত আছে, সমস্তই দ্ব্যর্থ-সূচক। সেই শব্দ-গুলি কিরূপ স্থলে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহা দেখিয়া তবে আমরা তাহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি, অর্থাৎ সে গুলি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত—ঐন্দ্রিয়ক অর্থে অথবা ভৌতিক অর্থে—তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এখানে বিশেষ যেটি দ্রষ্টব্য তাহা এই যে, বৈকারিক গুণ

গুলি স্বতঃ যে কি সে-বিষয়ে আমরা স্থির কিছুই বলিতে পারি না, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে তাহারা যেরূপ শব্দস্পর্শাদির অনুভব উৎপাদন করে, তাহা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জড়বস্তুর বৈকারিক গুণ আমরা আমাদের জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি করি, তাহা ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কাজেই, শুদ্ধ যদি কেবল সেই ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতিই জড়বস্তুর একমাত্র পরিচায়ক হইত, তবে জড়বস্তুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নিতান্তই সংশয়স্থলে নিপতিত হইত।

মৌলিকগুণের পরিচয় চিহ্ন ॥ ৫ ॥

মনোবিজ্ঞান বলে যে, জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি স্বতন্ত্র প্রকার; তাহারা জড়বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে। আকার বিস্তৃতি এবং সংঘাত (Solidity)—এইগুলিই প্রধানত জড়বস্তুর মৌলিক গুণ। শৈত্য ঔষ্ণ্যের ন্যায় এগুলিকে আমরা শুদ্ধ কেবল ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করি না, তা ছাড়া এগুলিকে আমরা বহির্বস্তুসমাশ্রিত বলিয়া উপলব্ধি করি। শৈত্য ঔষ্ণ্য, বর্ণ, শব্দ, এই সকল গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র—এবং ইহাদের মাত্রাতিশয্য হইলে ইহারা আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু ভৌতিক বস্তু-সকলের আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতের ওরূপ মাত্রাতিশয্য সম্ভবে না। এই ব্যাপারটি ঐন্দ্রিয়ক অনুভব এবং প্রত্যক্ষ এ দুয়ের প্রভেদ জ্ঞাপন করিতেছে।

ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত হইতে পারে—এবং কতক-নাকতক মাত্রা শারীরিক সুখ দুঃখ তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-নামক মনোবৃত্তি, যাহা আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত লইয়া ব্যাপৃত হয়, তাহা সেরূপ নহে; তাহার মাত্রা সর্ব্বদাই সমান, এবং তাহা শারীরিক সুখ-দুঃখে জড়িত নহে। প্রত্যক্ষ দ্বারাই আমরা জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি (অর্থাৎ আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত) অবগত হই—ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি দ্বারা নহে। মনোবিজ্ঞান আরো এই বলে যে, মৌলিক গুণ-বাচক শব্দ-গুলি বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দগুলির ন্যায় দ্ব্যর্থ-সূচক নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা একটি গুরুতর বিষয় যাহা মনোবিজ্ঞান আমাদের লক্ষ্যে আনয়ন করে তাহা এই যে, মৌলিক গুণগুলির সাহায্যে আমরা যে-সকল বস্তু উপলব্ধি করি—মৌলিক গুণ-গুলি সেই সকল বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে—আমাদের মনকে আশ্রয় করিয়া নহে; এ সকল গুণ আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহিরে উপলব্ধি করি—আমাদের মনের অভ্যন্তরে নহে। আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতের বাহ্য অস্তিত্ব আমরা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করি—সুতরাং তাহারা যে, বহির্ব্বস্তুরই গুণ, এ বিষয়ে আর আমাদের সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদি বৈকারিক গুণ-সকলের বাহ্য-সত্তা বিষয়ে আমরা স্থির কিছুই বলিতে পারি না,—কাজেই ইহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত।

জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই জাতীয় গুণের মধ্যে—প্রত্যক্ষ এবং ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির মধ্যে—মনোবিজ্ঞান যেরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করেন তাহা ঐ। ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি বলিয়া যে একটি মনোবৃত্তি—তাহা বৈকারিক গুণ-সকলের বাহ্যসত্তা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তাহা অন্তর্বাহ্যের মধ্যে ক্রমাগতই ইতস্ততঃ করে; আর, প্রত্যক্ষ বলিয়া যে একটি মনোবৃত্তি তাহা মৌলিক গুণ সকলের বাহ্য সত্তা অতীব স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করে।

মনোবিজ্ঞানের মতানুসারে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি মানসিক অবস্থার পরিচায়ক এবং প্রত্যক্ষ-বৃত্তি বহির্জগতের পরিচায়ক।

এই প্রকার প্রভেদের দোষ ॥ ৬ ॥

প্রভেদটি নিজে তত দোষের নহে। যদিচ ওরূপ প্রভেদ নিরূপণে বিশেষ কোন ফল দর্শে না, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই যে, জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি এক শ্রেণীভুক্ত ও তাহার বৈকারিক গুণ-গুলি আর এক শ্রেণী-ভুক্ত; শেষোক্ত গুণগুলি অস্পষ্ট এবং আনুভূতিক, পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। ফলে, মনোবিজ্ঞান এই যে একটি কথা বলিতেছেন যে বৈকারিক গুণগুলি দ্ব্যর্থ-সূচক, ইহার উত্তর এই যে, দ্ব্যর্থসূচকতার কথা যদি বল—তবে সে বিষয়ে বৈকারিক গুণও যেমন—মৌলিক গুণও তেমনি—দুইই সমান। আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত বলিতে শুদ্ধ কি কেবল বহির্ব্বিষয়েরই গুণ বুঝায়—আমাদের প্রত্যক্ষ-বৃত্তির পরিণাম বুঝায় না? প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত যে, কি, তাহা কি মনোবিজ্ঞান বলিতে পারেন, না কোন মনুষ্য তাহা বলিতে পারে? মৌলিক গুণের প্রত্যক্ষই কেবল আমাদের মানসক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—মৌলিক-গুণ স্বতন্ত্ররূপে তথায় উপস্থিত হয় না। তেমনি আবার, বৈকারিক গুণের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতিই কেবল আমাদের মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, বৈকারিক গুণ স্বতন্ত্ররূপে তথায় উপস্থিত হয় না। ইহাও যেমন উহাও তেমনি; উভয়েই একদিকে যেমন বহির্ব্বস্তুর গুণ, আর একদিকে তেমনি মনোবৃত্তির পরিণাম। অতএব বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দগুলিও যেমন—মৌলিক গুণবাচক শব্দগুলিও তেমনি—দ্ব্যর্থ-সূচকতা-বিষয়ে কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন নহে। কাজেই, দুয়ের প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা মৌলিক গুণের দ্ব্যর্থ-সূচকতা দোষ ঘুচাইতে গেলে, সে দোষ কিছু আর সত্য সত্যই ঘুচানো হয় না—শুদ্ধ কেবল গোপন করা হয় মাত্র। আর ঐ দুই জাতীয় গুণের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইতে গেলে—চক্ষে ধূলি দেওয়া রকমের একটা গোলমেলে সিদ্ধান্ত গড়িয়া তোলা হয় মাত্র।

উহা স্ববিরোধিতায় প্রধাবিত হয় ॥ ৭ ॥

কিন্তু এখানকার ভ্রম যেটি, তাহা উক্ত প্রভেদ-নিবন্ধন তত নহে—যত সেই প্রভেদের প্রয়োগ-নিবন্ধন। মনোবিজ্ঞানের হস্তে পড়িয়া ঐ প্রভেদটি স্পষ্ট একটি স্ববিরোধিতায় প্রধাবিত হয়। সে স্ববিরোধিতা অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে মূর্ত্তিমান—তাহা এই যে, জ্ঞাতা আপনাকে না জানিয়া জড়বস্তুর বিশেষ এক জাতীয় গুণ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারে। কোথা হইতে এই স্ববিরোধের সূত্র উত্থাপিত হয় তাহা অতঃপর দেখা যাইতেছে।

মনোবিজ্ঞানের মতে মায়াবাদ কিরূপ ॥ ৮ ॥

মনোবিজ্ঞান যাহাকে মায়াবাদ বলিয়া ভয় পা'ন, তাহার প্রতিবিধান-মানসেই তিনি ঐরূপ প্রভেদ নিরূপণে প্রবৃত্ত হ'ন। মনোবিজ্ঞানের মতে ঐরূপ প্রভেদের অস্বীকারের উপরেই মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভাবেন যে, মায়াবাদ ঐ দুই জাতীয় গুণকে মিসাইয়া এক করিয়া ফেলে—বৈকারিক গুণের ধর্ম্ম মৌলিক গুণে আরোপ করে—শৈত্য ঔষ্ণ্য প্রভৃতির ন্যায় আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতকে অন্তঃকরণের বিকার মাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করে। তাঁহার মতে, মায়াবাদ জড়বস্তুর বৈকারিক গুণ-সকলের ন্যায় তাহার মৌলিক গুণ-সকলকেও অ-

স্পষ্ট এবং দুর্ভেদ্য মনে করে। মায়াবাদ মনে করে যে, জড়জগতের আন্দোলন-কালে আমরা জড়-বস্তুর গুণ-সকল জ্ঞানে উপলব্ধি করি না; উপলব্ধি করিবার মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের কতক গুলি মানসিক বিকারই উপলব্ধি করি। মনোবিজ্ঞানী ভাবেন যে, এইরূপে মায়াবাদ জড়বস্তুর অস্তিত্ব হয় একেবারেই উড়াইয়া দে'ন—নয় বিষম ভজকটে ফেলিয়া দেন; কারণ, বৈকারিক গুণের যে দশা—মৌলিক গুণেরও যদি সেই দশা হয়, যদি দুই জাতীয় গুণের কাহাকেও আমরা স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে না পারি, আর যদি আমরা সমস্ত জড়-জগৎকে ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি পরম্পরায় পরিণত করিতে বাস্তবিকই সমর্থ হই, তবে তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির উত্তেজক কারণ—জড় জগৎ না হইয়া আর-কোন কিছু হইলেও হইতে পারে, কাজেই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা সংশয় স্থলে নিপতিত হয়; তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, অনুভবিতা'র বিলোপ হইলেই সমস্ত জড় জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেননা সমস্ত জড়জগৎ অনুভূতি-পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মনোবিজ্ঞানের মতে—ইহাই মায়াবাদ। মনোবিজ্ঞান ভাবেন যে, জড়জগতের মূলোচ্ছেদ করা—মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই জাতীয় গুণের প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তাকে জ্ঞান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া—ইহাই মায়াবাদের চরম উদ্দেশ্য। মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে মায়াবাদ নিম্ন-প্রকার অতিব্যাপ্তি দোষে দূষিত;—জড়বস্তুর কোন কোন গুণ (যেমন উত্তাপ শব্দ বর্ণ) পরীক্ষাতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, তাহারা আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি-মাত্র, অতএব জড়-বস্তুর সমস্ত গুণই আমাদের মনোবৃত্তির পরিণাম।

মনোবিজ্ঞান-কর্তৃক মায়াবাদের খণ্ডন ॥ ৯ ॥

"মায়াবাদের ভুল এইবার ধরা পড়িয়াছে—মায়াবাদ মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই বিভিন্ন জাতীয় গুণকে এক সঙ্গে মিসাইয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছেন" এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া, মনোবিজ্ঞান মায়াবাদের খণ্ডন-কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত হ'ন,—জড়জগতের নিকট হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা যাহা অবৈধ-রূপে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি ঐ প্রভেদটিকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতারণ করেন। ইহা তিনি স্বীকার করেন যে, জড়বস্তুর কোন কোন গুণ আমাদের মনোবৃত্তির পরিণাম-মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া জড়বস্তুর সকল গুণই যে সেইরূপ, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জড়বস্তুর আকৃতি আছে—বিস্তৃতি আছে—সংঘাত আছে, ইহারা ও-রূপে বাগ মানিবার পাত্র নহে; ইহারা শৈত্য ঔষ্ণ্য প্রভৃতির দলে মিশিয়া ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি সাজিতে কিছুতেই সম্মত হয় না। তবুও যদি ও-দুই শ্রেণীর গুণকে বল-পূর্ব্বক একত্র মিসাইতে যাও, তবে তেলে জলে মিসানোই সার হইবে। মৌলিক-গুণ সকল লুকাচুরি জানে না, তাহাদের ভিতর-বাহির সমান; তাহাদের সত্তা অতীব সুস্পষ্ট সত্তা, তাহার মধ্যে দুর্ভেদ্য কিছুই নাই। বৈকারিক গুণসকলই মূলবস্তুতে একরূপ এবং আমাদের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে আর-একরূপ, কিন্তু মৌলিক গুণ-সকল সেরূপ নহে। তাহারা পষ্টাপষ্টি মায়াবাদীর সম্মুখে দণ্ডায়-

মান হইয়া বলে যে, "তুমি তোমার সমস্ত গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর—পারিবে না।" আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি-বিষয়ে স্পষ্ট কোন কথাই বলে না, এমন কি জড়বস্তুর অস্তিত্বেরও সমুচিত প্রমাণ প্রদর্শন করে না; সে তাহা না করুক্—প্রত্যক্ষ বলিয়া আর-একটি মনোবৃত্তি যাহা আমাদের আছে, যাহা জড়বস্তুর আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত লইয়া ব্যাপৃত হয়, সেই প্রত্যক্ষ-বৃত্তি আমাদিগকে জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং সত্তাতে সহজেই পৌঁছাইয়া দেয়; আর, এই মৌলিক গুণ-সকলের সুব্যক্ত সত্তার বলেই আমরা জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিপাদন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না।

উহা স্ববিরোধী এই জন্য গ্রাহ্য নহে ॥ ১০ ॥

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, উপরি-উক্ত যুক্তিটি নিতান্ত বল-হীন নহে, কিন্তু উহার বলবত্তা শিরোধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সামান্য গুটি-দুই কথা বিবেচ্য। এ শুধু বলিলে চলিবে না যে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইতে বিভিন্ন, অথবা মৌলিক গুণ-সকল বৈকারিক গুণ-সকল হইতে বিভিন্ন; তা ছাড়া, এইটি দেখানো চাই যে, মৌলিক গুণ-সকল স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; মনোবিজ্ঞানী যতক্ষণ না এইটি দেখাইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ যুক্তিটিতে কোন ফল দর্শিতেছে না। জড়বস্তুর জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা প্রমাণ করাই মনোবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য। মনে কর যেন জড়বস্তুর ঐরূপ সত্তা আছে; কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? মনোবিজ্ঞানী বলিবেন যে, মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তাই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার একমাত্র প্রমাণ। উত্তম কথা,—মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তার প্রমাণ প্রদর্শন কর, তাহা হইলেই বিবাদ মিটিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা তুমি করিতেছ না—তুমি কেবল বলিতেছ যে, বৈকারিক গুণ (শব্দ-স্পর্শাদি) একজাতীয় গুণ এবং মৌলিক গুণ (আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত) আর-এক জাতীয় গুণ; হইলই বা আর একজাতীয় গুণ, তাহাতে কাহার কি আইসে যায়? মৌলিক গুণ কি জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য? তাহা হইলেই বলিতে পারি যে, মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা যখন আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য—তখন কাজেই তাহা আমাদের শিরোধার্য্য; কেননা জ্ঞানই সত্তার একমাত্র প্রমাণ। অতএব মনোবিজ্ঞানীর প্রকৃত অভিপ্রায়টিকে জঞ্জালমুক্ত করিয়া স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় যে, জড়বস্তুর বিশেষ এক-জাতীয় গুণ (মৌলিক গুণ) স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহির্ভূত রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, অতএব মৌলিক গুণ এবং তাহার আশ্রয়ীভূত জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে। ওরূপ স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে কি নাই এ বিষয়ে এখানে আমরা কোন কথাই বলিতে চাহি না, এখানে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, উপরি উক্ত যুক্তির গোড়ার কথাটি (অর্থাৎ "মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য" এই কথাটি) ভ্রমাত্মক ও স্ববিরোধী। ইহা একটি যুক্তিযুক্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী—অষ্টম সিদ্ধান্তের বিরোধী। যে-কোন জ্ঞাতা হউন্ না কেন,

স্পষ্ট এবং দুর্ভেদ্য মনে করে। মায়াবাদ মনে করে যে, জড়জগতের আন্দোলন-কালে আমরা জড়-বস্তুর গুণ-সকল জ্ঞানে উপলব্ধি করি না; উপলব্ধি করিবার মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের কতক গুলি মানসিক বিকারই উপলব্ধি করি। মনোবিজ্ঞানী ভাবেন যে, এইরূপে মায়া-বাদ জড়বস্তুর অস্তিত্ব হয় একেবারেই উড়াইয়া দে'ন—নয় বিষম ভজকটে ফেলিয়া দেন; কারণ, বৈকারিক গুণের যে দশা—মৌলিক গুণেরও যদি সেই দশা হয়, যদি দুই জাতীয় গুণের কাহাকেও আমরা স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে না পারি, আর যদি আমরা সমস্ত জড়-জগৎকে ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি পরম্পরায় পরিণত করিতে বাস্তবিকই সমর্থ হই, তবে তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির উত্তে-জক কারণ—জড় জগৎ না হইয়া আর-কোন কিছু হইলেও হইতে পারে, কাজেই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা সংশয় স্থলে নিপতিত হয়; তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, অনু-ভবিতা'র বিলোপ হইলেই সমস্ত জড় জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেননা সমস্ত জড়জগৎ অনুভূতি-পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মনোবিজ্ঞানের মতে—ইহাই মায়া-বাদ। মনোবিজ্ঞান ভাবেন যে, জড়জগতের মূলোচ্ছেদ করা—মৌলিক এবং বৈকা-রিক এই দুই জাতীয় গুণের প্রভেদ অ-গ্রাহ্য করিয়া জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তাকে জ্ঞান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া—ইহাই মায়াবাদের চরম উদ্দেশ্য। মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে মায়াবাদ নিম্ন-প্রকার অতি ব্যাপ্তি দোষে দূষিত;—জড়বস্তুর কোন কোন গুণ (যেমন উত্তাপ শব্দ বর্ণ) পরী-ক্ষাতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, তাহারা আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি-মাত্র, অতএব জড়-বস্তুর সমস্ত গুণই আমাদের মনো-বৃত্তির পরিণাম।

মনোবিজ্ঞান-কর্ত্তৃক মায়াবাদের খণ্ডন ॥ ৯ ॥

"মায়াবাদের ভুল এইবার ধরা পড়ি-য়াছে—মায়াবাদ মৌলিক এবং বৈকা-রিক এই দুই বিভিন্ন জাতীয় গুণকে এক সঙ্গে মিসাইয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছেন" এই-রূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া, মনোবিজ্ঞান মায়াবাদের খণ্ডন-কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত হ'ন,—জড়জগতের নিকট হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা যাহা অবৈধ-রূপে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি ঐ প্রভেদটিকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতারণ করেন। ইহা তিনি স্বীকার করেন যে, জড়বস্তুর কোন কোন গুণ আমাদের মনোবৃত্তির পরিণাম-মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া জড়বস্তুর সকল গুণই যে সেইরূপ, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জড়বস্তুর আকৃতি আছে—বিস্তৃতি আছে—সংঘাত আছে, ইহারা ও-রূপে বাগ মানিবার পাত্র নহে; ইহারা শৈত্য ঔষ্ণ্য প্রভৃতির দলে মিশিয়া ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি সাজিতে কিছুতেই সম্মত হয় না। তবুও যদি ও-দুই শ্রেণীর গুণকে বল-পূর্ব্বক একত্র মিসাইতে যাও, তবে তেলে জলে মিসানোই সার হইবে। মৌলিক-গুণ সকল লুকাচুরি জানে না, তাহাদের ভিতর-বাহির সমান; তাহা-দের সত্তা অতীব সুস্পষ্ট সত্তা, তাহার মধ্যে দুর্ভেদ্য কিছুই নাই। বৈকারিক গুণসকলই মূলবস্তুতে একরূপ এবং আমাদের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে আর-একরূপ, কিন্তু মৌলিক গুণ-সকল সেরূপ নহে। তাহারা পষ্টাপষ্টি মায়াবাদীর সম্মুখে দণ্ডায়-

মান হইয়া বলে যে, "তুমি তোমার সমস্ত গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর—পারিবে না।" আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি-বিষয়ে স্পষ্ট কোন কথাই বলে না, এমন কি জড়বস্তুর অস্তিত্বেরও সমুচিত প্রমাণ প্রদর্শন করে না; সে তাহা না করুক্—প্রত্যক্ষ বলিয়া আর-একটি মনোবৃত্তি যাহা আমাদের আছে, যাহা জড়বস্তুর আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত লইয়া ব্যাপৃত হয়, সেই প্রত্যক্ষবৃত্তি আমাদিগকে জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং সত্তাতে সহজেই পৌঁছাইয়া দেয়; আর, এই মৌলিক গুণ-সকলের সুব্যক্ত সত্তার বলেই আমরা জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিপাদন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না।

উহা স্ববিরোধী এই জন্য গ্রাহ্য নহে ॥ ১০ ॥

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, উপরি-উক্ত যুক্তিটি নিতান্ত বল-হীন নহে, কিন্তু উহার বলবত্তা শিরোধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সামান্য গুটি-দুই কথা বিবেচ্য। এ শুধু বলিলে চলিবে না যে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইতে বিভিন্ন, অথবা মৌলিক গুণ-সকল বৈকারিক গুণ-সকল হইতে বিভিন্ন; তা ছাড়া, এইটি দেখানো চাই যে, মৌলিক গুণ-সকল স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; মনোবিজ্ঞানী যতক্ষণ না এইটি দেখাইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ যুক্তিটিতে কোন ফল দর্শিতেছে না। জড়বস্তুর জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা প্রমাণ করাই মনোবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য। মনে কর যেন জড়বস্তুর ঐরূপ সত্তা আছে; কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? মনোবিজ্ঞানী বলিবেন যে, মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তাই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার একমাত্র প্রমাণ। উত্তম কথা,—মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তার প্রমাণ প্রদর্শন কর, তাহা হইলেই বিবাদ মিটিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা তুমি করিতেছ না—তুমি কেবল বলিতেছ যে, বৈকারিক গুণ (শব্দ-স্পর্শাদি) একজাতীয় গুণ এবং মৌলিক গুণ (আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত) আর-এক জাতীয় গুণ; হইলই বা আর একজাতীয় গুণ, তাহাতে কাহার কি আইসে যায়? মৌলিক গুণ কি জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য? তাহা হইলেই বলিতে পারি যে, মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা যখন আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য—তখন কাজেই তাহা আমাদের শিরোধার্য্য; কেননা জ্ঞানই সত্তার একমাত্র প্রমাণ। অতএব মনোবিজ্ঞানীর প্রকৃত অভিপ্রায়টিকে জঞ্জালমুক্ত করিয়া স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় যে, জড়বস্তুর বিশেষ এক-জাতীয় গুণ (মৌলিক গুণ) স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহির্ভূত রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, অতএব মৌলিক গুণ এবং তাহার আশ্রয়ীভূত জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে। ওরূপ স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে কি নাই এ বিষয়ে এখানে আমরা কোন কথাই বলিতে চাহি না, এখানে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, উপরি উক্ত যুক্তির গোড়ার কথাটি (অর্থাৎ "মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য" এই কথাটি) ভ্রমাত্মক ও স্ববিরোধী। ইহা একটি যুক্তিযুক্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী—অষ্টম সিদ্ধান্তের বিরোধী। যে-কোন জ্ঞাতা হউন্ না কেন,

তিনি আপনাকে উপলব্ধি না করিয়া জড়-বস্তুর কোন গুণই উপলব্ধি করিতে পারেন না। অতএব জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তার সপক্ষে মনোবিজ্ঞানী যত কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেন সমস্তই জ্ঞানের নিয়ম-বিরুদ্ধ ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সব যুক্তি একে তো আপন অভীষ্ট সাধনে অসমর্থ তাহাতে আবার জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম উল্টাইয়া দিয়া তত্ত্বজ্ঞানের মূল উৎস পর্য্যন্ত বিষায়িত করে।

দুই জাতীয় গুণের ভেদ-নিরূপণ অকিঞ্চিৎকর ॥ ১১ ॥

মৌলিক এবং বৈকারিক গুণের প্রভেদের বিষয় এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। এই প্রভেদটি মনোবিজ্ঞানের বিশেষ একটি নির্ভর-স্থল—ইহা হইতে তিনি বিস্তর ফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ প্রভেদটি কোন কার্য্যেরই নহে। ইহার বহ্বারম্ভ, দেখিতে দেখিতে, লঘু-ক্রিয়ায় পরিণত হয়। প্রকৃত মায়াবাদের কথা দূরে থাকুক্—মনোবিজ্ঞানী যাহাকে মায়াবাদ বলেন সেই কৃত্রিম মায়াবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়াও উহা আপনার অসারতা এবং অকিঞ্চিৎকরতা সপ্রমাণ করে। উহাকে উহার নিজ মূর্ত্তিতে দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জ্ঞানের নিয়ম সকলের বিরোধী ও তত্ত্বজ্ঞানকে বিপথে লইয়া যাইবার একটি প্রধান গুরু। তত্ত্বালোচনার সমুদ্র-বক্ষে উহা একটি বুদ্‌বুদ্ বই আর কিছুই নহে—এখন উহাকে চুপে চাপে ভগ্ন এবং বিলীন হইয়া যাইতে দেও। উহার যাহা কৃত্য উহা তাহা সাধ্যমতে করিয়া চুকিয়াছে—তাহাও ভাল করিয়া নহে।

আত্মা ও পরমাত্মা।

আত্মা ও পরমাত্মা এক নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই নিগূঢ় সম্বন্ধের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই উহারদের নৈকট্য প্রতিভাত হয়। উভয়ে উভয়ের সখা সযুজা না বুঝিলে কেমন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলনের গাঢ়তা হইবে। পৃথিবীতে দুইজনের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন পরস্পরের প্রকৃতি ভাব লক্ষ্য অবগত হওয়া চাই, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনন্তকালভোগ্য মিলনের পূর্ব্বে পরমাত্মার পিতৃভাব, আত্মার অমরত্ব, উহার অনন্ত গতি, অনন্ত উন্নতি, উহার অপূর্ণতা পরমাত্মার উপর একান্ত নির্ভরের ভাব অগ্রে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত।

আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যখনই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত, তিনি আমারদের পিতা; যখন তাঁহার স্নেহদৃষ্টি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল সময়ে সমান রূপে আমারদের উপরে নিপতিত দেখি তিনি আমারদের মাতা; যখন তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শুভবুদ্ধি কর্ত্তব্যজ্ঞান আমারদের অন্তরে নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন ও নানা রূপ বিপদাপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তিনি আমারদের বন্ধু, যখন তাঁহার অনুগত ও সেবক হইয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা ও ধ্যান ধারণা আমারদের জীবনের লক্ষ্য দেখি তখনই তিনি আমাদের প্রভু, যখন তাঁহাকে গতি মুক্তির নিদানভূত জানিয়া হৃদয়মন্দির হইতে সকল প্রকার নীচকামনা নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সেই সংমোহন মূর্ত্তিকে সংস্থাপিত

করি এবং তাঁহার প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়া বিমল শান্তি উপভোগ করিতে থাকি তখনই তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্যের স্বামী না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের সম্বন্ধ-বৈচিত্র এত অধিক যে যতই তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে থাকি ততই মনে নূতন ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। এই জন্য ঈশ্বর-চিন্তা কোন কালেই আমারদের নিকট পুরাতন হয় না। বাস্তবিক উহার মধ্যে এতই মাধুরী বিদ্যমান রহিয়াছে, যে, পৃথিবীর সকল প্রকার প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া সাধক কেবল তাঁহাতেই শান্তি পান, এবং বলিতে থাকেন "নাল্পে সুখমস্তি"।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই আত্মা। ইহাই উভয়ের ঐক্যস্থল। যে আপনাকে জানে সেই আত্মা। জীবাত্মা বলিতে পারে "আমি আছি"। শোণিত-মাংস-অস্থি-সমন্বিত জড় শরীর আপনাকে আমি বলিতে পারে না। মৃত্যুর সময়ে এ দেহ পড়িয়া থাকিবে, আমি বা আত্মা এ দেহ-পিঞ্জর হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবে। "আমি আছি" ইহাই জীবাত্মার নির্দ্দেশ, সুতরাং আমি কালে বদ্ধ। আত্মা নিরাকার সুতরাং দেশে ইহাকে বদ্ধ করা যায় না। পরমাত্মা অর্থাৎ "আমি আছি চিরকাল" ইহা দেশেও বদ্ধ নহে কালেও বদ্ধ নহে। এমন এক সময় ছিল যখন "আমি ছিলাম না।" ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ, সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আলোচনা করিলেন এবং এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। আত্মাকে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। তিনি "অজ আত্মা" তাঁহার জন্ম নাই বিকার নাই সুতরাং তিনি দেশ কালের অতীত। কিন্তু জীবাত্মার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না যে তিনি অজ আত্মা। ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ।

জীবাত্মা পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যতদিন তাঁহার ইচ্ছার বিরাম না হইবে ততকাল তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে। কিন্তু পরমাত্মা স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভু নিত্য পরিপূর্ণ ও নির্ব্বিকার। যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন পরমাত্মা নিদ্রিত থাকেন না। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ যিনি অন্ধকার রজনীর সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু মনুষ্যের চঞ্চলতা আছে, অজ্ঞানতা আছে, মোহ আছে, ভ্রম প্রমাদ আছে, বিকার আছে সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, জীবাত্মারও সজীবতা নির্জীবতা আছে। জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়েই আত্মা হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অধিক।

জীবাত্মা পরমাত্মার সাদৃশ্যে গঠিত হইয়া স্বয়ম্প্রকাশ পরমেশ্বরের প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। তিনিই ইহার আলোক তিনিই ইহার জীবন জ্যোতি সকলই। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি। যখনই মোহমেঘ অন্তরাকাশে উদিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তখনই আত্মা নির্জীব মৃতপ্রায় অসাড় হইয়া পড়ে।

পরক্ষণে যখন আত্মপ্রভাব ও ঈশ্বরকৃপায় রিপুকুল প্রশমিত হয়, হৃদয়রাজ্যে আশ্রমের চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সাধন তপস্যাবলে আত্মার বল বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। ঈশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি আত্মফলকে সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। যেমন স্বচ্ছ সরোবরে শশাঙ্কের মূর্ত্তি সহজে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ আপনার আপনার সাধনের গুণে ও দৈববলে অভ্যন্তরে বিভিন্নমুখী বৃত্তি প্রবৃত্তির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে শান্তস্বরূপ পরমেশ্বর দেখা দেন। ঈশ্বরের দিকেত আত্মার স্বাভাবিক গতি। আত্মার সে স্বাভাবিক গতির যাহাতে ব্যত্যয় না হয় সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর সুখের বিনিময়ে যদি সেই অক্ষয় ধন লাভ করা যায় তবে ইহা অপেক্ষা আমারদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা।

অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অথবা শুনিতে উৎসাহী হইতে পারেন, উৎসবে মাতিতে পারেন অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া দ্রবীভূত হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক হওয়া বড় সুকঠিন। রিপুদমনের বেলা প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অথবা শুনিতে উৎসাহী হইতে পারেন, উৎসবে মাতিতে পারেন অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া দ্রবীভূত হইতে পারেন কিন্তু সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অন্যায় কামাচরণের সুবিধা থাকিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা নিজ বিষয়ে কেহ বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে তাহাকে জব্দ করিবার বিশেষ সুযোগ হইলেও বিমুখ হওয়া কিম্বা অন্যায় রূপে এককালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা থাকিলেও সে সুবিধা পরিত্যাগ করা কিম্বা বিষয় রক্ষা এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কার্য্যে কিঞ্চিৎমাত্র অন্যায় ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা মিথ্যারূপে যে ব্যক্তি নিন্দা করিতেছে তাহাকে মনের সহিত ক্ষমা করা বড়ই সুকঠিন। এই সকল সময়ে ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা হয়। বাহিরে লোকে ধার্ম্মিকতার ভান করিতে পারে কিন্তু গৃহে অন্য আকার ধারণ করিতে পারে। ইংরাজীতে একটি জনসাধারণ বাক্য আছে "No one is a hero to his valet-de chamber"। "কেহই আপনার ভৃত্যের নিকট সুরবীর বলিয়া গণ্য হয়েন না।" ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। অজ্ঞ অশিক্ষিত ভৃত্যকে কথা শুনাইতে হইবে অথচ তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হইবে না ইহা বড় কঠিন কার্য্য। কাজের হানি না করিয়া কেবল ভাল কথা দ্বারা ভৃত্যদিগকে চালানোতে কোন ব্যক্তি প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক কিনা বুঝিতে পারা যায়। রোগের সময় সহিষ্ণুতা গুণে ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। জর্ম্মেনির সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডরিক যাঁহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার দীর্ঘকাল স্থায়ী নিদান পীড়ার সময় আপনাকে ঈশ্বরের একটি শিশু সন্তানের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর ও সহিষ্ণুতাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কত সময় পরিবার ও ভৃত্যদিগকে যতদূর সম্ভব উদ্বেজিত করিতেন না। আপনার হস্তে যতদূর পারেন কর্ম্ম করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের

মধ্যে প্রায় দেখা যায় অন্য সকল বিষয়ে ভাল হইলেও তাঁহাদিগের ক্রোধবৃত্তি কিছু প্রবল হয় এবং তাহা ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি বিশেষ রূপে পরিচালিত হয়। এইরূপ অনৌদার্য্য হইতে যিনি মুক্ত তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক। সমদম তিতিক্ষা, সদা সন্তোষ, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণা, এই সকল গুণ দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এই জন্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয় ইহা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন। জে গোল্ড (Jay Gould) ন্যায় লোকে পঞ্চান্ন কোটী টাকার অধীশ্বর হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া বড়ই কঠিন। আমরা অনেক সময় ধর্ম্ম কি কঠিন মনে করি না। আমরা অনেক সময় মনে করি কেবল বক্তৃতা অথবা উৎসবে মাতা অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া গলিয়া যাওয়া অথবা ঈশ্বরের নামশ্রবণে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভক্তি ধর্ম্মের প্রধান উপাদান বটে কিন্তু কোন মনুষ্যে যথার্থ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে কিনা তাহা সমদম তিতিক্ষাদি গুণের বর্ত্তমানতা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

মৃত্যু।

মৃত্যু কি ভয়াবহ শব্দ। মৃত্যু শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে সকলেই ত্রস্ত ও বিকম্পিত হয়। মৃত্যু এতাদৃশ ভয়াবহ হইবার কারণ কি? আমাদিগের অমরাত্মার বাস-গৃহ এই শরীরের নাশই মৃত্যু। ইহাতে আমরা এত ভয় পাই কেন? কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের কি প্রত্যয় হয় না যে, যে প্রেমময় পুরুষ আমাদিগের শরীরকে অতুল স্নেহে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন তিনি কি শরীরের প্রাণরূপী আমাদিগের জীবনের জীবন জীবাত্মাকে কখনই বিনাশ করিবেন না। জীবাত্মা অনন্তের আশ্রয়ে অনন্ত কাল থাকিয়া তাঁহার যশোঘোষণা করিবেক, তাঁহার প্রদত্ত প্রেমান্ন গ্রহণে দিন দিন পরিপুষ্ট হইবে, উন্নতির এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমানন্দ যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ ক্রমশঃ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়াও আমরা কি জীবাত্মার লোকান্তরিত হইবার সময় মুহ্যমান্ হইব? জীবাত্মা শরীর পরিত্যাগ সময়ে বিলাপ ও ক্রন্দন করে কেন? সংসারের প্রতি মোহ স্নেহাদির আধিক্যই ইহার কারণ। কিসে এই মোহাদির নিবারণ হয়? ঈশ্বর-প্রীতিই সেই মোহাদি নিরসনের এক মাত্র উপায়। কিন্তু ঈশ্বরেতে প্রীতি সংস্থাপন কালে আমরা কি জগৎকে উপেক্ষা করিব? না ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও প্রীতি করিব? ঈশ্বর-তত্ত্ব-রসপানার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরকেই প্রীতি করিবে এবং জগৎকে প্রীতি করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া তাহাকে প্রীতি করিবে। কিন্তু অনেকে কার্য্যকালে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন ও জগৎকে উপেক্ষা করেন।

ঈশ্বর-প্রীতির লক্ষণ কি? ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরধ্যান, ঈশ্বর গুণগান, তাঁহার অনুগত থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, পাপচিন্তা পাপালাপ পাপ কার্য্য পরিত্যাগ, তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন, ধর্ম্ম-বল প্রার্থনা ইত্যাদি। আর সংসারের প্রতি

প্রীতি কি প্রকারে প্রকাশ পায়? প্রাণ-পণ চেষ্টা দ্বারা পরদুঃখ বিমোচন, পর-সুখোন্নতি সাধন, পিতা মাতা সন্তান ভ্রাতা ভগিনী বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে সর্ব্বদা প্রীতি-নয়নে সন্দর্শন, তাঁহাদিগের অভাব নিবারণ, তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক পীড়া নিবারণ, এক কথায় কাহারো প্রেমে বিমুগ্ধ না হইয়া সাধ্যমতে লোকের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন, এই সকল কার্য্য দ্বারাই আমরা সংসারে প্রীতি করিয়া থাকি। এ দুই প্রকার প্রীতির কি সমন্বয় হয় না? অবশ্যই হয়। যেহেতু যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরপ্রীতিতে নিমগ্ন তিনি সহজেই আপন শরীর আত্মা পরার্থে উৎসৃষ্ট করিয়া থাকেন।

> শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
> য উত্তম-শ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
> জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
> মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরং॥
>
> ভাগবত ১।৪।১২

ভগবদ্ভক্ত জনগণ লোকের হিত ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য তৎপর থাকেন, তাঁহারা কেবল আত্মার্থ প্রাণ ধারণ করেন না।

অনেক ভক্তিমান্ লোকে ঈশ্বর-প্রীতিতে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণাতেই তৎপর কিন্তু পরদুঃখবিমোচনাদিতে তাদৃশ অগ্রসর হয়েন না। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণের দুঃখজনক হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন ধ্বনির প্রতি কি আমরা বধির হইয়া থাকিব? আমাদিগের ভ্রাতৃগণ জ্ঞান, অর্থ, শারীরিক বল ও ধর্ম্ম-বল অভাবে পীড়া অকালমৃত্যু পাপ তাপ দারিদ্র্য প্রভৃতি কত নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেছে, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না? তৎপ্রশমন জন্য একটী অঙ্গুলীও কি উত্তোলন করিব না? ঈশ্বর করুন যেন আমাদিগের এ প্রকার ঔদাসীন্য না হয়, যেন আমরা সংসারকে তাঁহার অভিমতানুসারে যথার্থ প্রীতি করিতে পারি।

যিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও সংসারের প্রতি প্রীতি এ দুই প্রীতি দ্বারা আপন জীবনকে নিয়মিত করেন, মৃত্যু তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন। প্রীতি-সুধা-পানে সবল হইয়া তিনি সংসারের আকর্ষণ শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করেন। এখানে চিরকালের জন্য আসি নাই, কিছু দিন পরে এখান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইবেক, যতদিন এখানে থাকিব ততদিন পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় জনগণের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি ও স্নেহ সহকারে সন্তোষ সাধন করিব, সাধ্যানুসারে দেশের উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার ও লোকের দুঃখ দূর করিতে যত্নশীল থাকিব, দিন দিন তাঁহারই প্রেমে আবদ্ধ হইব যিনি আমাদিগের চিরকালের পিতা মাতা ও সুহৃৎ। এ প্রকার ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ও অমৃত নিত্য প্রেমদাতার প্রেম-নয়নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থির ভাবে নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করেন। ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের জীবন এই বাক্য সমর্থন করিতেছে।

ধর্ম্মপরায়ণা এলিজেবেথ ফ্রাই নয়টী সন্তানের প্রসূতী হইয়াও সংসারাসক্ত হয়েন নাই। অথচ তাহাদিগের লালন পালন জন্য জননী-সুলভ স্নেহ ও যত্ন করি-

তেন। তিনি লোকহিতৈষণাপরায়ণা হইয়া প্রাণপণে লোকহিত সাধন করিতেন। তিনি পিতৃবিয়োগ ও প্রাণাধিক প্রিয়তর সন্তান বিয়োগে শোকে অভিভূত হইয়া অচিরে তৎশোক সম্বরণে সমর্থা হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়িতা হইয়া নির্ভয়ে ইহলোক হইতে অবসৃতা হয়েন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে "যে অবধি আমার অন্তরে ঈশ্বর-অনুরাগ প্রবেশ করিয়াছে সেই অবধি কি সুস্থ কি রুগ্ন শরীরে এইটী মনে না করিয়া আমি প্রতি দিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি নাই যে অদ্য কি প্রকারে আমি প্রভুর অনুমোদিত কার্য্য করিব" তৎপরে তিনি তাঁহার কোন পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার দেহে যাতনা কিন্তু আমার আত্মাতে ভয় নাই। তৎপরে "হে প্রভো! তোমার দাসীকে সাহায্য ও রক্ষা কর" এই বলিয়া চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যিনি আমরণ ঈশ্বরের সেবক হয়েন, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার মৃত্যুভয় কোথায়? সংসারের প্রতি মোহান্ধ হওয়াই মৃত্যু-ভয়ের কারণ। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিই সেই মোহ ভঞ্জনের মহৌষধ। সেই প্রীতিই যেন আমাদের আত্মার একমাত্র উপজীব্য হয়।

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান।

তিনি প্রাণদাতা, তিনি পিতা পাতা, তিনি প্রভু সবাকার।
তিনিই সৃজন, পালন কারণ, সকলের মূলাধার॥

যাঁহার রচনা—শশি দিবাকর,
অযুত তারকা, ভূধর সাগর,
পতঙ্গ বিহঙ্গ যত জীবগণ,
ফলে ফুলে ধরা অতুল শোভন,
তিনিই সবার হয়েন কারণ,
তাঁর কার্য্যে ফেরে চরাচরগণ॥
তাঁহার নিয়মে ভ্রমে গ্রহ তারা।
অসীম আকাশে নহে পথহারা॥
রবি শশী করে কর বিতরণ।
মেঘ বর্ষে বারি, বহিছে পবন॥
তাঁহার শাসনে ঋতু আসে যায়।
গিরি হ'তে নদ নদী বেগে ধায়॥
তাঁহার ইচ্ছায় সবে ভ্রাম্যমাণ।
সে ইচ্ছা এখনো আছে বিদ্যমান॥
সে ইচ্ছার স্রোতে চলিছে ভুবন।
কতই মঙ্গল করিছে সাধন॥
তিনিই জাগ্রৎ জীবন্ত ঈশ্বর।
অসীম জগৎ ঘোষে নিরন্তর॥
"তাহার মহিমা অসীম অপার।
তাঁর দয়া প্রেম—অন্ত নাহি তার"॥

জগৎ যাঁহার আজ্ঞাধীনে রয়।
হে নর! তিনিই তোমার আশ্রয়॥
কি সৌভাগ্য তব ভেবে দেখ মনে।
রবে চির দিন তুমি যাঁর সনে॥
তিনিই তোমারে দেন অধিকার।
তাঁরে ভজিবার—তাঁরে সাধিবার॥
দেখ—অমৃতের পথের সোপান।
তিনি দয়া করি তোমারে দেখান॥
করিছেন কত অমৃত বর্ষণ।
বলিছেন কত অমিয় বচন॥
দেখ কৃপা তাঁর—কাতরে যে জন।
হৃদয়ে তাঁহারে ডাকে অনুক্ষণ॥
তাঁরে ছাড়া যবে চাহে না সে আর।
করয়ে তাঁহারে জীবনের সার॥
তবে তিনি তার বুঝিয়া হৃদয়।
আপনারে দান করেন নিশ্চয়॥
দাও তাঁরে সব হৃদয় তোমার।
পাবে প্রতিদান সহবাস তাঁর॥
প্রেমময় রূপে দিয়া দরশন।
করিবেন তব হৃদয় পূরণ॥

করিছেন তিনি তোমারে আহ্বান।
তাঁর পথে তুমি হও আগুয়ান॥
দেখিবে তাঁহার উৎসাহ জনন।
বরাভয়প্রদ প্রসন্ন বদন॥
তোমার যতন করিতে বর্দ্ধন।
পথের কণ্টক করি বিমোচন॥
দিবেন তোমারে আপন সুছায়।
অমৃতের বারি—স্বরগের বায়॥

এক মনে লও তাঁহার শরণ।
ঘুচাবেন তিনি ভবের বন্ধন॥
দেখ তিনি হ'ন অতুল বিভব।
তাঁর তুলনায় তুচ্ছ আর সব॥

ধন ধান্য আদি যা কিছু সংসারে।
তিনি ছাড়া তৃপ্তি কেবা দিতে পারে?
দেখ দেখ তাঁর প্রীতির নয়ন।
ভজ তাঁরে হবে সফল জীবন॥
কর তাঁর নাম হৃদয়ে সাধন।
হইবেন তিনি—হৃদি প্রিয়ধন॥
নয়ন-রঞ্জন—পরশ রতন।
পাপের দমন—দুঃখের হরণ॥

ভেবে দেখ কি সম্বন্ধ হয় তাঁর সনে।
মনুষ্য হইয়া তাহা পাল সযতনে।
তাঁরে করি শিরোধার্য্য, কর জীবনের কার্য্য,
টলোনা টলোনা আর মোহের ছলনে॥

খুলে দাও দাও তাঁরে হৃদয় দুয়ার।
প্রেম সত্য রূপ তাঁর ভাব অনিবার॥
আপনার আপনার, রেখোনা করোনা আর,
তাঁহার অধীন হও, ছাড় স্বেচ্ছাচার॥

স্বেচ্ছাচারে হয় নর প্রবৃত্তি অধীন।
পশুর সমান বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম হীন।
আপনার প্রভু নয়, প্রবৃত্তির দাস হয়,
তার চেয়ে হতভাগ্য আছে কে বা দীন?

ঝটিকা যেমন করে নৌকারে মগন।
ইন্দ্রিয়ের পরবশ হয় যদি মন।
সেই মন প্রজ্ঞা হরে, সংসার তরঙ্গে নরে
ডোবাইয়া করে তার মৃত্যুর সাধন॥

পাপের দাসত্বে নর যে যাতনা পায়।
এক মুখে কভু তাহা বলা নাহি যায়।
পাপে দেহ ম্রিয়মাণ, কলুষিত মনঃ প্রাণ,
পাপ তেয়াগিতে সবে করহ উপায়॥

একা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হয় পাপ প্রশমন।
পাপের ঔষধ ইহা হয় অতুলন।
এ ধর্ম্মের যিনি প্রাণ পাপহারী ভগবান্,
শুভ মতি সাধকেরে দেন অনুক্ষণ॥

এ ধর্ম্মে স্বাধীন মোরা অবশ্য হইব।
প্রবৃত্তির দাস হয়ে আর না থাকিব।
আপনার প্রভু হয়ে, আপন জীবন লয়ে,
জীবন দাতার পদে উপহার দিব॥

রিপুর দাসত্ব হ'তে যে চাও নিস্তার।
চিত্তের সন্তোষ যেবা চাহ আপনার।
এ ধর্ম্ম আশ্রয় লও, স্বাধীন পবিত্র হও,
মিলিবে সে ধন যার তুল নাহি আর।

পূর্ব্বদিকে উদি যথা নবীন তপন।
চারিদিকে ক্রমে করে কর বিতরণ।
বঙ্গাচলে তথা আজি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সুবিরাজি,
ধরাময় প্রকাশিবে কিরণ আপন।

বঙ্গভূমি সহে দুঃখ পর্ব্বত প্রমাণ।
হেট মুখে রহে সদা বঙ্গের বয়ান।
ঘুচিবে বঙ্গের দুখ, হইবে বিপুল সুখ,
ব্রহ্ম নামে সবে যবে হবে এক প্রাণ॥

এদেশের দীন দশা দেখি দয়াময়,
বিনাশিতে নিদারুণ এর দুঃখ চয়।
দিলেন এ ধর্ম্ম ধন, কর তাহে সুরক্ষণ
এই ধর্ম্ম দিয়া বাঁধ সবার হৃদয়॥

এ ধর্ম্ম হৃদয়ে রাখ করিয়া যতন।
তাঁর কাছে শুভমতি করহ যাচন।
চাও তাঁরে দিব্য জ্ঞান, নূতন জীবন প্রাণ,
চাও তাঁর প্রেম মুখ করিতে দর্শন॥

তাঁহার প্রসাদ তিনি করিবেন দান।
তাঁর বলে করিবেন তোমা বলীয়ান।

তাঁহার কবচ পরি, বিঘ্ন ভয় পরিহরি,
তাঁর কার্য্য সাধিবারে দাও মন প্রাণ ॥

রক্ষ এই ধর্ম্মে, ইহা তোমারে রক্ষিবে।
দেহে বল মনে শান্তি ইহ মুক্তি দিবে।
কপটতা মলিনতা, যাবে পাপ কুটিলতা,
ধর্ম্মের পবিত্র মঞ্চে ক্রমে আরোহিবে।

শুধু মরতের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়।
দেবতারা এই ধর্ম্ম সেবেন নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মেতে মগন হয়ে, তাঁর প্রেম কার্য্য লয়ে
থাকেন স্বরগে দেব পুণ্যাত্মা নিচয়।

প্রার্থনা।

কবে নাথ! ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে বিস্তার।
কবে দ্বেষ মলিনতা যাবে হাহাকার।
তোমা পেয়ে সবে হবে আনন্দ মগন।
তব প্রেমে পাবে সবে নূতন জীবন।
কবে সবে মিলে নাথ! তোমারে ঘোষিবে।
ভক্তি প্রেম দিয়া তব চরণ পূজিবে।
প্রেম সত্য রূপে হৃদি তুমি দেখা দাও।
তোমার অরূপ রূপ মধুর দেখাও।
দাও তব সহবাস, তোমার স্মরণ।
আপনি আসিয়া কর হৃদয় পূরণ।

ইতি ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

গত আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতামত সম্বন্ধে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছে। আমরা স্থানাভাব বশতঃ তৎসম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই। ফলত ঐ পত্রে এমন সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে যেগুলি শাস্ত্র ও যুক্তির এককালে অধিকার বহির্ভূত। সুতরাং সে সকল কথার আলোচনা করা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করি না। তবে এইটুকু বলা সঙ্গত যে যখন গোস্বামী বহুদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং তিনি স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়াছেন তখন তাঁহাকে আর কি বলিয়া ব্রাহ্ম বলিতে পারি। আর তিনি যে স্বমুখে ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম এ কথাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়। ফলত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা নিত্য নির্ব্বিকার নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যাঁহার বিশ্বাস তিনিই ব্রাহ্ম। আর যিনি বহুদেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করেন তিনি ব্রাহ্ম নামেরই যোগ্য নহেন। ঈশ্বরের মূর্ত্তি নাই। তিনি অকায়মব্রণং। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে সেই নিষ্কল অক্ষর ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হয়। তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য নহেন। মন বুদ্ধিও তাঁহার নিকট পরাস্ত। আমাদের এই আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি। নিজের কঠোর সাধনা ও ব্রহ্মকৃপায় এই আত্মাতে এক একবার সেই বিদ্যুৎপুরুষের স্ফূর্ত্তি অনুভব করা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এত কাল এই কথাই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। যিনি ইহার বিরুদ্ধ বলেন এবং বিরুদ্ধ আচরণ করেন তিনি ব্রাহ্ম হইতে পারেন না। নৃসিংহ একটী পৌরাণিক অবতার। ব্রাহ্মধর্ম্মে অবতারবাদ নাই। এই অব-

তারবাদে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি ঘোর পৌত্তলিক। তিনি স্বমুখে ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রচার করিলেও লোকে আর তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কোনও যোগ আছে ইহাও কেহই স্বীকার করিবেন না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৯ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৵১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাক মাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো। কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪১ সংখ্যা | ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ৯ ॥

অহম্পদার্থ বা আত্মা স্বতঃ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। স্বতঃ—অর্থাৎ বিশেষ কোন-কিছুর সহিত—বাহিরের কোন বস্তুর সহিত কিম্বা অন্তরের কোন ভাবনার সহিত—সম্পর্ক না রাখিয়া একাকী। উহা বিশেষ কোন-না-কোন আন্তরিক অবস্থার সহিত অথবা বিশেষ কোন না কোন বহির্বস্তুর সহিত—আত্মেতর কোন-না-কোন-কিছুর সহিত—সম্পৃক্ত ভাবেই আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে।

প্রমাণ।

অহম্পদার্থ সকল-জ্ঞানেরই সার্ব্বভৌমিক অবয়ব (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। কিন্তু জ্ঞান-মাত্রেরই একদিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক অবয়ব থাকা চাই, আর একদিকে তেমনি বিশেষ-অবয়বও থাকা চাই; তা ভিন্ন—বিশেষ হইতে পৃথক্কৃত সার্ব্বভৌমিক অবয়বের অথবা সার্ব্বভৌমিক হইতে পৃথক্কৃত বিশেষ অবয়বের কোন জ্ঞানই সম্ভবে না (৩ সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব অহম্পদার্থ বা আত্মা স্বতঃ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। অন্তরের বিশেষ কোন অবস্থার সহিতই হউক্, আর, বাহিরের বিশেষ কোন বস্তুর সহিতই হউক্, বিশেষ কোন-না-কিছুর সহিত সম্পৃক্ত ভাবেই জ্ঞাতা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের তুলনা ॥ ১ ॥

প্রথম সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আত্ম-জ্ঞান-ব্যতিরেকে আত্মেতর-জ্ঞান সম্ভবে না; বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আত্মেতর-জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্ম-জ্ঞান সম্ভবে না। ইহার প্রতি অনেকে অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, অতএব ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা আবশ্যক।

প্রথম আপত্তি ॥ ২ ॥

"আত্মজ্ঞান আত্মেতর জ্ঞানের সম্বন্ধ-সাপেক্ষ" এ কথা বলিলে তাহাতে কি এইরূপ বুঝায় না যে, প্রথম সিদ্ধান্তে

যাহা জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা—বাস্তবিক—জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম নহে? কেননা প্রথম সিদ্ধান্তে যেমন দেখা গিয়াছে যে, "আত্মেতর-জ্ঞান আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গ-সাপেক্ষ" এইটিই জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম—বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে তেমনি পাওয়া যাইতেছে যে, ঐটিই যে জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম তাহা নহে; তদ্ভিন্ন জ্ঞানের আর একটি মূল নিয়ম এই যে, আত্ম-জ্ঞান আত্মেতর-জ্ঞানের সঙ্গ-সাপেক্ষ। আত্মেতর-জ্ঞান যেমন আত্মজ্ঞানের সঙ্গাধীন, আত্মজ্ঞানও যদি তেমনি আত্মেতর-জ্ঞানের সঙ্গাধীন হয়, তবে দুইটি নিয়মের একটিই বা বড় কিসে—অন্যটিই বা ছোট কিসে? দুয়েরই তো পদবী অবিকল সমান। তবে আর কেমন করিয়া বলি যে, প্রথম নিয়মটিই শিরঃস্থানীয় ও দ্বিতীয় নিয়মটি তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয়।

আপত্তি-খণ্ডন ॥ ৩ ॥

তাহাতে কোন দোষ নাই; আপাততঃ যাহা গোলোযোগের মতো দেখাইতেছে—অনতি-পরেই তাহা দিব্য পরিষ্কার বেশে দেখা দিবে। প্রথম সিদ্ধান্তে যে নিয়মটি স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রধান পদবীর উপযুক্ত; কেননা তাহা এমনি একটি অবশ্য-জ্ঞেয় বস্তুর নাম নির্দ্দেশ করিতেছে—যাহাকে না জানিয়া অন্য কোন-কিছুকেই জানা সম্ভবে না; কি? না অহম্পদার্থ। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বলিতেছে বটে যে, আপনাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে অন্য কোন-না-কোন-কিছু জানা আবশ্যক, কিন্তু সেই যে "কোন-না-কোন-কিছু" তাহা যে, কি, তাহার নাম নির্দ্দেশ করিতেছে না—কেমন করিয়াই বা করিবে? জ্ঞানের বিশেষাত্মক অবয়ব-সকল দেশ-ভেদে বিভিন্ন, কাল-ভেদে বিভিন্ন, পাত্র-ভেদে বিভিন্ন, তাহা নিতান্তই অনির্দ্দেশ্য। অতএব প্রথম সিদ্ধান্ত এবং বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত, দুইই যদিচ সুনিশ্চিত সত্য, তথাপি প্রথম সিদ্ধান্তের প্রদর্শিত জ্ঞানের নিয়মটি প্রধান পদবীর উপযুক্ত, তাহাতে আর ভুল নাই। বস্তু অসংখ্য—তাহার মধ্যে যে-কোনটিকেই হউক্ আর যতগুলিকেই হউক্ জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে যখন একই অদ্বিতীয় বস্তুকে—আপনাকে—জানা আবশ্যক, তখন এই নিয়ম অগ্রে,না আপনাকে জানিতে হইলে সেই অসংখ্য বস্তুর যে-টি হউক্ একটিকে জানা আবশ্যক—এই নিয়ম অগ্রে? অবশ্য—দুইই সমান সত্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মটিই প্রধান আসন পাইবার যোগ্য ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন এই যে, জ্ঞানের অদ্বিতীয় এমন একটি মূল উপাদান কি, যাহাকে না জানিয়া অন্য কোন বস্তুকেই জানা যাইতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে অহম্পদার্থ। কিন্তু যদি প্রশ্নটি ওরূপ না হইয়া এইরূপ হইত যে, জ্ঞানের অদ্বিতীয় এমন একটি মূল উপাদান কি যাহাকে না জানিয়া আপনাকে জানা যাইতে পারে না? তবে এরূপ প্রশ্ন নিতান্তই অর্থ-শূন্য; কেননা আত্মেতর বস্তু-সকলের একটিও এরূপ অবশ্য-জ্ঞেয় নহে যে, আপনাকে জানিতে হইলে সেইটিকে না জানিলেই নয়। প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যে কিরূপ সম্বন্ধ, আর, কি-সেই বা প্রথম সিদ্ধান্ত প্রধান পদবীর উপযুক্ত, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে; তাহা এই যে, প্রথম সিদ্ধান্ত যাহাকে জ্ঞানের মূল উপাদান বলিয়া প্র-

তিপাদন করিতেছে, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট এ-কটি-মাত্র বস্তু—আত্মা; আর, বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত যাহাকে জ্ঞানের অপর উপাদান বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা অ-নির্দ্দিষ্ট কোন-না-কোন বস্তু—অনাত্মা; অনাত্মা বলিতে সুনির্দ্দিষ্ট একটি-মাত্র কোন বস্তু বুঝায় না।

দ্বিতীয় আপত্তি এবং তাহার খণ্ডন ॥ ৪ ॥

এ যেমন সত্য যে, জড়-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-মাত্রই, সংক্ষেপে—ভৌতিক-জ্ঞান মাত্রই, আত্মজ্ঞান-সাপেক্ষ; এটাও কি তে-মনি সত্য যে, আত্মজ্ঞান-মাত্রই ভৌতিক জ্ঞান-সাপেক্ষ? না, সেরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। আপনাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে বিশেষ কোন-না-কোন কিছু জানা নিতান্তই আবশ্যক—এইমাত্র; কিন্তু সেই যে "বিশেষ কোন-না-কোন কিছু" তাহা ভৌতিক বস্তু না হইয়া আর কোন-কিছু হইলেও হইতে পারে—মানসিক ভাব-বিশেষ বা অবস্থা-বিশেষ হইতে পারে। পাছে কেহ মনে করেন যে, "ভৌতিক জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্ম-জ্ঞান সম্ভবে না" এইটি প্রতিপাদন করাই আ-মাদের মনোগত অভিপ্রায়, এইজন্য আ-মরা চতুর্থ সিদ্ধান্তেও বলিয়াছি এবং এখানেও বলিতেছি যে, তাহা নহে; আত্ম-জ্ঞানের পক্ষে যাহা নিতান্ত নহিলে নয় তাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের কোন-না কোন প্রকার বিশেষ অবয়বের উপলব্ধি; এ নিয়মটি সাধারণতঃ সকল জ্ঞানের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু জ্ঞানের সেই যে বিশেষ অবয়ব তাহা ভৌতিক বস্তু না হইয়া একটা মানসিক কল্পনা (যেমন পক্ষীরাজ ঘোড়া) অথবা একটা মানসিক অবস্থা (যেমন ম-নের স্ফূর্ত্তি, আলস্য, ইত্যাদি) অথবা একটা মানসিক অনুভূতি (যেমন সুখ দুঃখ) হইতে না পারে এমন নহে। অতএব এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই যে, আপনাকে জা-নিতে হইলে তাহার সঙ্গে কোন-না-কোন ভৌতিক বস্তুকে না জানিলেই নয়। আ-মরা যখন একটিও-কোন ভৌতিক বস্তুকে জানিতেছি না, তখনও আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা-বিশেষের জ্ঞাতা বলিয়া সচ্ছন্দে আপনাকে আপনি উপলব্ধি ক-রিতে পারি।

ডেবিড্ হিউমের মত ॥ ৫ ॥

ডেবিড্ হিউম্ তাঁহার মানব-প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, "আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে যখনই আমি আপনার অভ্যন্তরে তদ্‌গত ভাবে অভিনি-বিষ্ট হই, তখনই আমি বিশেষ কোন-না কোন প্রকার অনুভূতিতে সহসা আটক পড়িয়া যাই—যেমন শীতোষ্ণ—আলোক অন্ধকার—রাগ-দ্বেষ—সুখ দুঃখ—ইত্যাদি। বৃত্তি-হীন অবিকৃত অবস্থায় একবারও আমি আপনি আপনার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দিই না।" হিউম্ এ যাহা বলিয়া-ছেন—ঠিকই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সি-দ্ধান্ত ঐ কথাই বলিতেছে। কিন্তু হিউম্ আর একটি কথা যাহা বলেন—সেটি বড় গোলোযোগের কথা। তিনি ব-লেন যে, তাঁহার প্রত্যক্ষ এবং অনু-ভূতি প্রভৃতি বৃত্তি-সকল যাহা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা অহং-ব-র্জ্জিতরূপেই—আত্ম-বর্জ্জিতরূপেই—প্রতি-ভাত হয়। তিনি বলেন যে, "প্রত্যক্ষাদি বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই আমি আপনার অভ্যন্তরে দেখিতে পাই না।" তবেই হইতেছে যে, প্রত্যক্ষাদি মনোবৃত্তি আমারও নহে এবং আর কা-হারো নহে। ইহার ন্যায় দ্বিতীয় এমন একটি গায়ের জোরের কথা তত্ত্বজ্ঞান-

ক্ষেত্রে মেলা ভার। মনুষ্য আপনাকে অবিশিষ্ট অবস্থায়—অর্থাৎ বিশেষ কোন কিছু দ্বারা অনুপরক্ত অবস্থায়—উপলব্ধি করিতে পারে না, এই যথার্থ কথাটির উদ্গীরণে ক্ষান্ত না থাকিয়া হিউম্ আরো এই বলেন যে, মনুষ্য আদবেই আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে না। এটা বৈশিষ্ট্যবাদের আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি। হিউমের দার্শনিক আলোচনা অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষের বিষ; অথচ হিউমের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁহারা হিউমের ঐ কথাটিই উল্টিয়া পাল্টিয়া বলিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতিবাদ আর কিছু নয়—হিউম্ যাহা স্পষ্ট-বাক্যে বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা অতীব অস্পষ্ট এবং সন্দিগ্ধ বচনে ঘোর-ফের করিয়া বলিয়াছেন—এই মাত্র।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥ ৬ ॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল এই যে, আপনাকে জানিতে হইলে আপনাকে বিশেষ কোন-একটা অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া জানা চাই; তা সে—যে অবস্থাই হউক্ না, আর, যে কোন-প্রকারেই তাহা সংঘটিত হউক্ না—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, একটা কোন অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া জানিলেই হইল। এ সিদ্ধান্তটি জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য। জ্ঞাতা কোন একটিও বিশেষ অবস্থায় দণ্ডায়মান না হইয়া আপনাকে আপনি জানিতে পারে—এরূপ মনে করাই ভ্রম। কেননা, জ্ঞাতা আপনার কোন অবস্থাতেই আপনাকে উপলব্ধি করিতেছে না অথচ আপনাকে উপলব্ধি করিতেছে, উপলব্ধি করিতেছে না অথচ উপলব্ধি করিতেছে, ইহা কত বড় একটা স্ববিরোধী কথা!

জ্ঞাতা আপনার কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থাতে আপনাকে উপলব্ধি করে বটে, কিন্তু সেই বিশেষ অবস্থা বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করে না ॥ ৭ ॥

"জ্ঞাতা আপনার কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থাতেই, বা কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই, আপনাকে উপলব্ধি করে" এ কথার অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, জ্ঞাতা আপনাকে আপনার কোন-একটি বিশেষ অবস্থা বলিয়া উপলব্ধি করে। এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেরই ন্যায় স্ববিরোধী। "আত্মাকে তাহার কোন অবস্থাতেই জানিতেছি না, অথচ আত্মাকে জানিতেছি" এটা যেমন অসঙ্গত, "আত্মাকে তাহার কোন-একটি অবস্থা-বিশেষ বলিয়া জানিতেছি" এটাও তেমনি অসঙ্গত। কেননা, আত্মা যদি আপনাকে আপনার বিশেষ কোন-একটি অবস্থা বলিয়া জানিতে বাধ্য হইত, তবে সে অবস্থা-ব্যতিরেকে আর-কোন অবস্থাতেই আত্মা আপনাকে আপনি জানিতে সমর্থ হইত না; কাজেই আত্মার জ্ঞান-বৈচিত্র্য ও ধ্যান-বৈচিত্র্যের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, এবং বৈচিত্র্য-বিরহে তাহার জ্ঞান সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহা হইলে ফলে এইরূপ দাঁড়াইত যে, অহম্পদার্থ আপনার সকল অবস্থার সাধারণ কেন্দ্র নহে—অহম্পদার্থ বিশেষ-একটি অবস্থা মাত্রেই পর্য্যবসিত; তবেই হইল যে, সামান্যের সহিত সম্পর্ক-রহিত বিশেষ—জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; কিন্তু ইহা যে, কত বড় একটা স্ববিরোধী কথা তাহা তৃতীয় সিদ্ধান্তের অকাট্য যুক্তির বলে এখন আর কাহারো জানিতে বাকি নাই। এটা যদিও সুনিশ্চিত যে, আত্মা আপনার কোন-না-কোন প্রকার বিশেষ অবস্থাতেই আপ-

নাকে আপনি উপলব্ধি করে; কিন্তু তাহা বলিয়া এটা ঠিক্ নহে যে, আত্মা আপনাকে আপনার সেই বিশেষ অবস্থা বলিয়া, অথবা, বিশেষ বিশেষ নানা অবস্থার সমষ্টি বলিয়া, উপলব্ধি করে। জ্ঞাতা আপনাকে আপনার সমস্ত অবস্থা হইতে ভিন্ন বলিয়াই উপলব্ধি করে—এমনি একটি সার্ব্বভৌমিক পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করে যাহা—কি সম্মুখ-স্থিত পরিবর্ত্তনশীল বস্তু-সমূহ—কি অন্তরস্থিত পরিবর্ত্তন-শীল ভাবনা-সমূহ, সমস্তেরই মধ্যে, স্বয়ং অটল এবং অবিচ্যুত-রূপে দণ্ডায়মান। আত্মাকে তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থার অভ্যন্তরে জানা স্বতন্ত্র, আর, আত্মাকে তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা বলিয়া জানা স্বতন্ত্র; এ দুই কথার প্রভেদের প্রতি দৃষ্টি না করাতেই হিউম্ উপরি-উক্ত ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন; আর, অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞেরাও (বিশেষতঃ ব্রাউন্) আপনাদের দার্শনিক নৌকাকে ঐ প্রকার অনবধানতার গুপ্তশৈলে নিপাতিত করিয়া ভ্রান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের একটি সর্ব্বোচ্চ ভ্রম-সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা শুদ্ধ কেবল আপনার পরিবর্ত্তনশীল বিশেষাত্মক বৃত্তিগুলিই জ্ঞানে উপলব্ধি করে; আর, আপনাকে আপনার সেই সকল বৃত্তির প্রবাহ-রূপেই উপলব্ধি করে।

নবম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

অহম্পদার্থ স্বতঃ—সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বসাধারণতঃ জ্ঞানের অগম্য নহে। আমরা যে, আমাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ কৈবল্য অবস্থায় উপলব্ধি করি না, সে কেবল আমাদের মনোবৃত্তির অপূর্ণতা-নিবন্ধন; কিন্তু যোগী মহাপুরুষেরা—যাঁহাদের জ্ঞান আমাদের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে তাঁহারা—স্ব স্ব আত্মাকে সর্ব্বাবস্থা-বিনির্মুক্তরূপে উপলব্ধি করিলেও করিতে পারেন।

দ্বিবিধ ভ্রম ॥ ৯ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের এই মতটি যদিচ লৌকিক চিন্তায় তেমন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয় নাই, কিন্তু মনোবিজ্ঞান ঐ মতটিকে প্রশ্রয় দান করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে একটুও ক্রটি করেন নাই; এমন কি—অনেক স্থলে উহাকে অবশ্য-গ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়ই বলো, আর, অবস্থা-ভ্রষ্ট আত্মাই বলো—তাহা যে, কি কারণে আমাদের জ্ঞানাতীত, মনোবিজ্ঞান তাহার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝিতে না পারিয়া তাহার একটা কৃত্রিম সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন—এইটিই তাঁহার ভ্রমের মূল। মনোবিজ্ঞানের ভ্রম দ্বিবিধ। প্রথম; জ্ঞানের প্রধান যে-একটি নিয়ম—যাহা সকল জ্ঞানের পক্ষেই সমান বলবৎ—মনোবিজ্ঞান তাহা দেখিয়াও দেখেন না; তাহা এই যে, কোন জ্ঞাতাই আপনাকে সর্ব্বাবস্থা-বিনির্মুক্ত-রূপে জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারে না। দ্বিতীয়; ঐরূপ অসাধ্য-সাধনে কেন যে আমরা অপারগ তাহার কারণ তিনি এই দেখান্ যে, আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা তাহা পারিয়া উঠি না, এ নহে যে, উপরি উক্তি নিয়মটি সকল-জ্ঞানের পক্ষেই অনতিক্রমণীয় বলিয়া আমরা তাহা পারিয়া উঠি না। আমাদের জ্ঞান খুবই অপূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া—জ্ঞান আপনার মূল নিয়ম আপনি উল্টাইতে পারে না—আপনি আপনার মূলোচ্ছেদ করিতে পারে না—এটা কিছু আর জ্ঞানের অপূর্ণতার লক্ষণ নহে; যে নিয়মটির উপরে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব নির্ভর করিতেছে তাহার অপরি-

হার্য্যতাকে জ্ঞানের অপূর্ণতা বলিয়া দোষ দেওয়া কোন-প্রকারেই বিধেয় নহে। জ্ঞানের এটা একটা অখণ্ডনীয় নিয়ম যে,যে-কোন জ্ঞান হউক্ না কেন তাহার সার্ব্বভৌমিক অবয়বটি স্বতঃ (অর্থাৎ কোন না কোন বিশেষ অবয়বের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে) কোন প্রকারেই কাহারো উপলব্ধি-গম্য নহে (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। এ নিয়মটি জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য, এবং বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত ইহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

তত্ত্ব-শব্দের ঐতিহাসিক বিবরণ ॥ ১০ ॥

আত্মার "নিগূঢ় তত্ত্ব" সম্বন্ধে নানা প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি যাহা তত্ত্বালোচনার ইতিবৃত্তে সময়ে সময়ে দেখা দিয়াছে, এই স্থানটি তাহার পর্য্যালোচনার সবিশেষ উপযোগী। তত্ত্ব-শব্দের অর্থ পুরাকালে একরূপ ছিল, এখন আর-একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে, কোন বস্তুর তত্ত্ব বলিতে বস্তুটির মর্ম্মস্থানীয় এমনি একটি অবয়ব বুঝাইত যাহা তাহার অপরাপর সমস্ত অবয়বের উপর জ্ঞানালোক ছটকাইবার মূলাধার। পূর্ব্বে উহা ছিল—আলোকের বীজ, জ্ঞাতব্য বস্তুর প্রকৃত অভিজ্ঞান। তত্ত্ব—কিনা যে বস্তু যাহা সেই বস্তুর তাহাত্ব, অর্থাৎ যাহা দৃষ্টে নানা বস্তুর মধ্য-হইতে সেই বস্তুটিকে ঠিক্‌ঠাক্ চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং তখনকার মতানুসারে, যে বস্তুর যে অবয়বটি বিশিষ্ট-রূপে জ্ঞানাস্পদ এবং ধ্যানাস্পদ, তাহাই সেই বস্তুর তত্ত্ব। এখনকার মতানুসারে, তত্ত্বশব্দের অর্থ ঠিক্ তাহার বিপরীত। এখন কার কালে "নিগূঢ় তত্ত্ব" বলিতে বস্তুর এমনি একটি অবয়ব বুঝায়, যাহার নিজেরও কোন আলোক নাই এবং যাহার উপর অন্যত্র-হইতেও আলোক নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এখনকার কালের "নিগূঢ়তত্ত্ব" অন্ধকারের আড্ডা; উহা বস্তু সকলের এমনি একটি কাল্পনিক অবয়ব যেখানে জ্ঞানেরও প্রবেশ নিষেধ—ধ্যানেরও প্রবেশ নিষেধ। এখনকার মতানুসারে যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগোচর এবং ধ্যানের অগোচর তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। পরে প্রকাশ পাইবে যে, পূর্ব্বতন কালের আরো অনেকগুলি শব্দের অর্থ এইরূপ ঘাঁটিয়া ঘুঁটিয়া লণ্ড ভণ্ড করা হইয়াছে।

অর্থ-বিপর্য্যয়ের ফল ॥ ১১ ॥

কোন-একটি দার্শনিক শব্দকে নূতন অর্থে প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহার অর্থ পূর্ব্বে কি ছিল তাহা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া এবং তাহার সেই পূর্ব্বতন অর্থের সহিত তাহার আধুনিক অর্থের প্রভেদ কিরূপ তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া—আধুনিক অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু "তত্ত্ব" এ শব্দটির সম্বন্ধে সেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, তত্ত্ব-শব্দের অর্থ তাঁহারা যেরূপ বোঝেন, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরাও সেইরূপ বুঝিতেন; এই কারণ-বশত পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নামে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য তমসাচ্ছন্ন বিষয়-সকলেরই আলোচনায় অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকিতেন। এরূপ অমূলক অপবাদ দ্বিতীয় একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধানেই বৃথা কাল-ক্ষেপ করিতেন; আর, সে কাল অপেক্ষা এ কাল নাকি বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য—তাই নব্য দার্শনিকেরা স্থির-স্থা করিয়া বসিয়া আ-

ছেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের তত্ত্বানুশীলন—আগা গোড়া সমস্তই পাগলামি, কেননা নিগূঢ় তত্ত্ব মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। তোমরা যাহাকে তত্ত্ব বলিতেছ তাহা ঐরূপই বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যাহাকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহা আর-এক প্রকার। তাঁহাদের মতানুসারে, বস্তুর সেই অংশটিই তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য যাহা সুস্পষ্ট-রূপে মনোমধ্যে ধারণা-যোগ্য; তোমাদের নব্য মতানুসারে বস্তুর সেই অংশটিই কেবল তত্ত্বশব্দের বাচ্য, যাহার কোন ভাবই কাহারো জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের শব্দের অর্থ তুমিই উল্টাইয়া দিয়া একটা বিপরীত কাণ্ড করিয়া তুলিতেছ—তাঁহাদের পরিষ্কার আলোক নিভাইয়া দিয়া দিক্ বিদিক্ অন্ধকার করিয়া দিতেছ, আবার তুমিই বলিতেছ যে, তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন বোধাতীত বিষয় সকলের আলোচনায় সময় নষ্ট করিতেন। অপরাধ—তোমার না তাঁহাদের? তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় তোমার স্বকপোল-কল্পিত উল্টা অর্থেই তমসাচ্ছন্ন ও বোধাতীত, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রেত সোজা অর্থে তাহা তমসাচ্ছন্নও নহে—বোধাতীতও নহে।

উল্টা অর্থের ফল ॥ ১২ ॥

উল্টা অর্থটিকে শুদ্ধ যদি কেবল একটা নূতন নামকরণ বলিয়া ধরা যায়, তবুও সেরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তন করা—কাজটা ভাল হয় নাই। একটা গোলমেলে এবং অলীক দার্শনিক মতের প্রচার ভিন্ন উহাতে করিয়া আর কোন ফলই লভ্য হইতে পারে না। এখনকার কালে বিষয়-ভ্রষ্ট, অবস্থা-ভ্রষ্ট, জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা, এবং আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব, এ দুই কথা একই অর্থে পরিগৃহীত হইয়া থাকে; আত্মার অব্যক্ত ভিত্তিমূল জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে মনোবিজ্ঞান ঐ দুই কথা নির্ব্বিশেষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিষয়ভ্রষ্ট আত্মা যে একান্ত-পক্ষেই জ্ঞান-বহির্ভূত এবং অচিন্তনীয়, এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই; যদিচ মনোবিজ্ঞানী যে কারণে তাহাকে অচিন্তনীয় বলেন, আমরা তাহাকে সে কারণে অচিন্তনীয় বলি না—আমরা তাহাকে আর এক কারণে অচিন্তনীয় বলি। মনোবিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ—এই জন্য জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; আমরা বলি যে, জ্ঞানের নিয়মই এই যে, জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা কাহারো জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে—কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে; বক্র ঋজু-রেখা যেমন কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে—জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা সেইরূপ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানবহির্ভূতও নহে অচিন্তনীয়ও নহে—তাহা খুবই চিন্তনীয়। আত্মা যাহা কিছু জানে তাহারই সঙ্গে আত্মজ্ঞান অবিচ্ছেদে স্ফূর্ত্তি পায়, এবং সেই আত্মজ্ঞানই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব; কেন না আত্মজ্ঞানেই আত্মার আত্মত্ব। আত্মজ্ঞান চলিয়া গেলে আত্মাও চলিয়া যায়, আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আত্মাও ফিরিয়া আসে। অতএব আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান-বহির্ভূত হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা আত্মজ্ঞান স্বয়ং; তাহা অচিন্তনীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহা চিন্তার ধ্রুব তারা।

বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মা স্ববিরোধী ॥ ১৩ ॥

ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, সপ্তম সিদ্ধান্তে যেমন আশয়-ভ্রষ্ট জড়-বস্তু, বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে সেইরূপ বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মা—দুইই স্ববিরোধীর কোটায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; দুয়ের কোন-টিই

কাহারো জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। দুইই যদিচ স্ববিরোধী, কিন্তু দুয়ের মধ্যে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে—তাহা এই যে, আপনার বিরোধ ভঞ্জনের শক্তি, অর্থাৎ স্ববিরোধের অন্ধকূপ হইতে আপনাকে জ্ঞান-রাজ্যে উত্তোলন করিবার শক্তি, আত্মার আপনার অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। আত্মা আপনার ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা আপনাকে বিশেষিত করিতে পারে অর্থাৎ আপন ইচ্ছায় বিশেষ কোন-না-কোন বিষয় মানসক্ষেত্রে উদ্ভাবন করিতে পারে। কিন্তু জড়বস্তু স্ববিরোধের ঘুমের ঘোরে এরূপ মন্ত্রাহত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা ভঞ্জন করা তাহার নিজের সাধ্যাতীত; তাহার ভঞ্জনের জন্য তাহাকে আত্মার দ্বারস্থ হইতে হয়। এ প্রভেদটি সামান্য প্রভেদ নহে,—ইহাতে করিয়া আশয়-ভ্রষ্ট জড় বস্তু অপেক্ষা বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মার অসীম শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে—যদিচ দুইই স্ববিরোধী।

ব্যক্তিত্ব ॥ ১৪ ॥

অহম্পদার্থ (যাহা জ্ঞানের সর্ব্বসাধারণ অবয়ব) এবং বহির্বস্তু বা মানসিক অবস্থা বা আর কোন-কিছু (যাহা জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব) এই দুয়ের সঙ্ঘাতেই ব্যক্তির-ব্যক্তিত্ব। জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ লাইব্‌নিট্‌জ ইহাকেই অণুক (Monad) নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন; অণুক—অর্থাৎ অখণ্ড মৌলিক বস্তু। এইরূপ মৌলিক বস্তু সার্ব্বভৌমিকত্ব এবং বিশেষত্ব এই দুয়ের সংঘাত। আত্মা এবং তাহার বৃত্তি-প্রবাহ দুয়ে মিলিয়া জ্ঞান-সমক্ষে যে একটি সমগ্র বস্তু দাঁড়ায়—তাহাই ব্যক্তি-শব্দের বাচ্য। কেননা জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ব্যক্তি-যোগ্য (অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য) নহে; আবার, জ্ঞানের বিশেষ বৃত্তি-সকলকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াও জ্ঞাতা ব্যক্তি-যোগ্য নহে; সুতরাং আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় এবং বিষয়-ভ্রষ্ট আশয় দুইই অব্যক্তি; দুয়ের সঙ্ঘাতই ব্যক্তি।

আপত্তি-খণ্ডন ॥ ১৬ ॥

পরিশেষে, নিম্ন-লিখিত দুইটি বিষয়ে পাছে কাহারো মনে কোন-প্রকার ধোঁকা থাকিয়া যায়, এ জন্য মন্তব্য-চ্ছলে গুটি দুই কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ কেহ বলিতে পারেন যে, তোমার মতে অহংপদার্থ জ্ঞানের শুদ্ধ কেবল একটি অবয়ব-মাত্র বলিয়াই উপলব্ধি-গম্য—জ্ঞানের অভৌতিক অবয়ব বলিয়া উপলব্ধি-গম্য, সমগ্র একটি অভৌতিক বস্তু বলিয়া নহে; তবে আর হইল কি? ইহার উত্তর এই যে, আত্মা তাহার সমস্ত জ্ঞানের সার্ব্ব-ভৌমিক এবং অভৌতিক অবয়ব বলিয়া আপনাকে আপনি জানে ইহা একটি সুনিশ্চিত সত্য; আর, ভৌতিক বস্তু প্রমাণে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, তাহা অনেক সময় যদিচ জ্ঞানের বিশেষ অবয়বের স্থলাভিষিক্ত হয় কিন্তু তাহা যে জ্ঞানাভ্যন্তরে না থাকিলেই নয় এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই—তাহার পরিবর্ত্তে মানসিক কোন-একটা-কিছু থাকিলেও জ্ঞানের কার্য্য চলিতে পারে; আর, সেই যে মানসিক বস্তু তাহা আত্মার নিজের শক্তি-সম্ভূতই হউক্, আর,ঈশ্বর-দত্তই হউক্ উভয় পক্ষেই তাহা অভৌতিক। আমাদের বক্তব্য শুদ্ধ কেবল এই যে, জ্ঞানের সার্ব্ব-ভৌমিক অবয়ব এবং তাহার বিশেষ অবয়ব—এই দুই অবয়বের কোনটিই অপরটির সঙ্গ ছাড়িয়া, একাকী, জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; এ নহে যে, বিশেষ অবয়বটি ভৌতিক না হইলেই নয়। অতএব, পাঠক যদি আমাদের নিকট

হইতে এরূপ একটা অসঙ্গত আত্মসত্তার প্রমাণ প্রত্যাশা করেন—যাহা ভৌতিক বা অভৌতিক একটিও কোন বিশেষাত্মক সত্তার সহিত আদবেই কোন সম্পর্ক রাখে না, তবে আমরা স্পষ্টই বলিতেছি যে, তাঁহার সে আশা নিতান্তই দুরাশা; তাঁহার মনোরথ পূরণ করা তত্ত্ব-জ্ঞানের সাধ্যাতীত।

ঐ ॥ ১৭ ॥

অপর কেহ বলিতে পারেন যে, এই যে একটি কথা তুমি বলিতেছ যে, আত্মা স্বতঃ একেবারেই জ্ঞান-বহির্ভূত এবং স্ববিরোধী, ইহা আত্মার বাস্তবিক সত্তার পক্ষে হানি-জনক; ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, আত্মা ঐকান্তিক নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অবস্তুরই সামিল। ইহার উত্তর এই যে, হইলই বা—তাহাতে ক্ষতি কি? আমি যদি বিশেষ কোন ভাবে বা বিশেষ কোন অবস্থায় বা বিশেষ কোন-কিছুর সংস্রবে না থাকিলাম, তবে সেরূপ থাকিয়া ফল কি? এমন একটা স্ববিরোধী সত্তা যাহা কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পাইবার নহে তাহার মূল্য যে কি—তাহা মনোবিজ্ঞানীরা ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয় করুন্, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের নিকট তাহার কোন মূল্যই নাই। এক দিকে আত্মা এবং আর এক দিকে বিশেষ কোন মানসিক ভাবনা অথবা বিশেষ কোন ভৌতিক বিষয়, এই দুয়ের সঙ্ঘাতেই আত্মার বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানে প্রকাশিত হয়; এই সত্য বৃত্তান্তটিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া—আত্মা যে অংশে একেবারেই জ্ঞান-বহির্ভূত—যে অংশে তাহা বিষয়-বর্জ্জিত, ভাবনা-বর্জ্জিত, অবস্থা-বর্জ্জিত, তাহার জন্য কাহার যে কি এত মাথাব্যথা তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে হয় তো ঐ লোক-প্রচলিত ভ্রান্তি-টি—জ্ঞান-বহির্ভূত সত্তার জন্য বৃথা আঁকুবাঁকু—সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে। আমাদের এই তন্ত্র আত্মার ভাবী গতির পক্ষে যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং যেরূপ দৃঢ় ভিত্তি-মূলের উপরে আত্মার অমরত্ব সংস্থাপন করে, কোন মনো-বিজ্ঞানই সেরূপ পারে না।

ইহার ফল ॥ ১৯ ॥

এ যখন হইল—আশয়-ভ্রষ্ট জড় বস্তুর স্ববিরোধিতা যখন স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য একটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ইহাতে করিয়া প্রতিপক্ষের সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গিয়া তত্ত্বজ্ঞানের পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইল। তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য একটি প্রশ্নে নূতন আলোক নিপতিত হইল। সে প্রশ্ন এই যে, জ্ঞানের অপরিহার্য্য উপকরণ—অপরিহার্য্য অবয়ব—কি? ইহারই আর-এক পৃষ্ঠা এই যে, সেই অপরিহার্য্য অবয়বটি অপসারিত হইলে জ্ঞেয় বিষয়ের কি অবশিষ্ট থাকে? ইহার উত্তর এই যে স্ববিরোধীই কেবল অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধির জন্য নিতান্তই যাহা নহিলে নয়, তাহা যদি তাহা হইতে অপসারিত করা যায়, তবে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা একান্ত পক্ষেই অজ্ঞেয় এবং অচিন্তনীয়, এক কথায়—স্ববিরোধী, এভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার পরেই আসিতেছে যে, সেই যে স্ববিরোধী—তাহা কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু; আরো ব্যাপক-রকমের উত্তর এই যে, তাহা আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়—কেননা জড়-বস্তু ভিন্ন আরো অনেক প্রকার বিষয় আছে (যেমন মানসিক ভাবনা-বিশেষ)। এইটিই (আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়ই) সমস্ত জ্ঞানের

স্ববিরোধী অবয়ব, এইটিকে জয় করা, এই গহন অরণ্য প্রদেশটিকে আবাদ করিয়া অবিদ্যাকে বিদ্যায় পরিণত করা, জ্ঞানের একমাত্র কার্য্য।

স্ববিরোধীকে হস্তে পাওয়ার ফল ॥ ২০ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ববিরোধীকে জ্ঞানে উত্তোলন করা কিরূপে হইতে পারে? স্ববিরোধীর স্ববিরোধিতা কিরূপে ঘুচানো যাইতে পারে? অচিন্তনীয়কে কিরূপে চিন্তনীয় করিয়া তোলা যাইতে পারে? যাহা একন্ত-পক্ষেই অবিজ্ঞেয় তাহাকে কিরূপে জ্ঞানায়ত্ত করা যাইতে পারে? পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট তত্ত্বজ্ঞানের মীমাংস্য প্রশ্ন এই আকারেই দেখা দিয়াছিল, দেখা দিয়াছিল মাত্র—খুব যে স্পষ্টরূপে দেখাদিয়াছিল তাহা নহে। তাহার সাক্ষী—প্লেটো এইরূপ বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান আর কিছু নয়—মানব আত্মাকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে উত্তোলন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। প্রকৃত কথা এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী শুধু নয়—সকল মনুষ্যই ঐ স্ববিরোধী অবয়বটিকে জয় করিয়া অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করিয়া থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী তাহার প্রণালী জানিয়া তাহা করে, অপর লোকে তাহার প্রণালী না জানিয়া তাহা করে। স্ববিরোধীর বিরোধ-ভঞ্জন যে-কোন উপায়েই হউক্ না কেন—প্লেটোর মতানুযায়ী মৌলিক ভাব সকলের সাহায্যেই হউক্, আর, আমাদের মতানুযায়ী অহম্পদার্থের কর্ত্তৃত্বেই হউক্—এটা স্থির যে, আমরা যাহাকে স্ববিরোধী অচিন্তনীয় এবং অজ্ঞেয় বলিতেছি তাহা যে, কি বস্তু, তাহা যে পর্য্যন্ত না খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে সে পর্য্যন্ত তাহার বিরোধ-ভঞ্জন সম্বন্ধে একটিও কথা উচ্চারণ করা কাহারো মুখে শোভা পায় না। আমরা তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি; তাহা কি? না স্বতন্ত্র-রূপী জড়-বস্তু। তাই অজ্ঞান কিরূপে জ্ঞানে উদ্ধৃত হয়—এখন আমরা তাহা দেখাইতে পারি।

স্ববিরোধী কি ভাবে চিন্তনীয় ॥ ২১ ॥

আমরা বলিতেছি বটে যে, আমরা স্ববিরোধীকে মুষ্টি-মধ্যে পাইয়াছি; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, স্ববিরোধী কখনও কাহারো জ্ঞান-গোচর অথবা ধ্যান-গোচর হইতে পারে। স্ববিরোধী একান্ত-পক্ষেই অচিন্তনীয়—এইরূপেই তাহা চিন্তনীয়। স্ববিরোধীর অচিন্তনীয়তা-লক্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। স্ববিরোধীর ভাবনা এক হিসাবে খুবই সহজ। মনে ভাবো যে, পুস্তকের এই পাতাটির এ-পৃষ্ঠা আছে—ও-পৃষ্ঠা নাই, তাহা হইলেই একটা স্ববিরোধী বিষয় তোমার ভাবনাতে আরূঢ় হইবে। পাঠক বলিবেন যে, "কোনক্রমেই তাহা আমি ভাবিতে পারি না।" সত্য, এক হিসাবে কোন-ক্রমেই তাহা তুমি ভাবিতে পার না; কিন্তু আর-এক হিসাবে তাহা তুমি অতীব স্পষ্টরূপে ভাবিতে পার—এইরূপে তাহা তুমি ভাবিতে পার যে, তাহা কেহই ভাবিতে পারে না; তাহাকে তুমি একান্তই ধ্যানের অগোচর বলিয়া ভাবিতে পার। স্বতন্ত্র-রূপী জড় বস্তুর চিন্তনীয়তার দৌড় এই পর্য্যন্ত—ইহার অধিক নহে।

স্বতন্ত্ররূপী জড় বস্তু একেবারেই অসৎ নহে ॥ ২২ ॥

এই অনির্বাচ্য পদার্থটির কি অস্তিত্ব আছে? এ প্রশ্নটিকে আর একটু পাকিতে দেও—অস্তি-তত্ত্ব ইহার সমুচিত মীমাংসা

করিবে। তত্ত্বজ্ঞানীরা উহার অপক্ব অবস্থায় উহাকে করায়ত্ত করিতে গিয়া বার-ম্বার বিপদে পড়িয়াছেন। একটি বিষয়ে পাঠক নিশ্চিন্ত থাকুন্ ;—স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু যে, আদবেই কিছু নহে—একেবারেই শূন্য, এরূপ কথা আমরা বলি না। সত্তাও যত প্রকার অসত্তাও তত প্রকার,—যেমন আলোক অন্ধকার—শব্দ নিঃস্তব্ধতা—জড়বস্তু শূন্য-আকাশ ইত্যাদি। আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে উপস্থিত হইতে হইলে—সত্তাই যে কেবল অহংসাপেক্ষ তাহা নহে, অসত্তাও অহংসাপেক্ষ। জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে হইলে আলোকও যেমন—অন্ধকারও তেমনি, শব্দও যেমন নিঃস্তব্ধতাও তেমনি, সকলই, অহংসাপেক্ষ। কিন্তু "স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু" শূন্য-আকাশাদির ন্যায় অসত্তা নহে, কেননা শূন্য আকাশাদি জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য—স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু একেবারেই জ্ঞানের অগম্য। মায়াবাদ যদি এ কথা বলে যে, স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু কিছুই নহে, তবে আমরা এই দণ্ডেই মায়াবাদের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। * প্রকৃত মায়াবাদ ওরূপ কথা বলে না। কিন্তু প্রকৃত মায়াবাদ কি জগতের সমস্ত বস্তুকেই জ্ঞানের প্রতিভাস-মাত্র বলে না? মনে কর যেন তাহাই সে বলে,—তেমনি, প্রকৃত মায়াবাদ জগতের সমস্ত অসত্তাকে (শূন্য-আকাশাদিকে) কি জ্ঞানের প্রতিভাস-মাত্র বলে না? জড়-বাদী মনে করেন যে মায়াবাদীর বুঝি এইরূপ মত যে, যখন একখানি বস্ত্রকে দৃষ্টির অগোচরে সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া রাখা যায় তখন বস্ত্র-খানি একেবারেই নাস্তি হইয়া যায়। তিনি ত বে বলুন্ না কেন যে, মায়াবাদীর মতানুসারে বস্ত্র-খানি তখন রুটি হইয়া যায়! বস্ত্র-খানি যদি শূন্য হইয়া যাইতে পারিল, তবে রুটি হইয়া যাইতে না পারিবে কেন? শূন্যও যেমন—রুটিও তেমনি—দুইই তো অবস্ত্র; বস্ত্রও যেমন জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়, অবস্ত্রও তো তেমনি জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়; কোনটিই তো আর জ্ঞান-ছাড়া নহে। পূর্ব্বে নয় বস্ত্রখানি দৃশ্য বস্তু-রূপে প্রতিভাসিত হইয়াছিল—এখন নয় শূন্য আকাশ-রূপে প্রতিভাসিত হইল—উভয়-পক্ষেই উহা জ্ঞানের প্রতিভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মায়াবাদ এরূপ কথা বলে না যে, কোন-একটি বস্তু যখন জ্ঞানের প্রতিভাস-রাজ্য হইতে একেবারেই বহিষ্কৃত হয়, তখন তাহা জ্ঞানের এক প্রকার প্রতিভাস হইতে আর-এক-প্রকার প্রতিভাসে পরিণত হয়। না, বস্ত্র বা আর কোন কিছু জ্ঞান-বহির্ভূত হইলে তাহা নিখিল প্রতিভাস-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়া ঐকান্তিক স্ববিরোধী অবস্থায়—ঐকান্তিক অচিন্তনীয় অবস্থায়—নিপতিত হয়; সে অবস্থা-হইতে উদ্ধারের এক উপায় কেবল—কোন-না-কোন জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন-বস্তুকে নিখিল জ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া জানা না যায়—না যা'ক্, ভাবা যাইতে পারে তো? সে বিষয়ে

* প্রকৃত মায়াবাদ এমন বলে না যে, অবিদ্যা কিছুই নহে; তাহা এই বলে যে, অবিদ্যা সৎ এবং অসৎ (কিছু এবং কিছু না) উভয়াত্মক; অথবা যাহা একই কথা, সৎও নহে অসৎও নহে—দুয়ের বা'র। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেমন—যেই আছে সেই নাই, আছে অথচ নাই, তাহাকে জ্ঞানে ধরিতে-ছুঁইতে পাওয়া যায় না—অবিদ্যা সেইরূপ একটি জ্ঞান-বিরোধী ব্যাপার। অবিদ্যাকে জ্ঞানে যেই তুমি ধরিবে—সেই তাহা বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইবে, অবিদ্যা যে-কে-সেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। অবিদ্যা যে-দণ্ডে যাহা—সেই দণ্ডে তাহা নহে—এইরূপ একটি স্ববিরোধী ব্যাপার।

বড়ই সন্দেহ। দশম সিদ্ধান্ত পার হইয়া একাদশ সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ওরূপ জ্ঞান-বহির্ভূত বস্তু জ্ঞানের যেমন অগোচর, ধ্যানেরও তেমনি অগোচর।

অধিকার।

আজকাল বড় একটা অনধিকার চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার গতিবিধির আকর্ষণে দেশ আজকাল এমনি আকৃষ্ট হইয়া আছে যে, যেমন সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে বিষশোষক প্রস্তর প্রযুক্ত হইলে তাহা সমুদয় বিষ টুকু টানিয়া লইয়া পড়িয়া যায় সেইরূপ এই দেশ অনধিকার-চর্চ্চারূপ হলাহল টানিয়া টানিয়া বিচ্ছেদ পতনোন্মুখী হইতেছে।

বাস্তবিক অনধিকার চর্চ্চা কিছুই নাই। তবে ইহা বলি কেন? শুদ্ধ বোধের তারতম্য অনুসারে। অধিকারটা কি! অধিকারের মূলস্থান কোথায়? ইত্যাদিরূপ, অধিকারের মর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অধিকারের চর্চ্চা করাই অনধিকার-চর্চ্চা। কোন্ বিষয়ে কাহার না অধিকার আছে সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? তাহা বোঝে অতি অল্প জন। এই বোঝা না বোঝার দরুণ অধিকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে—বৈষম্য জাগিয়া ওঠে। এই বৈষম্য হইতে কত শত ক্ষুদ্রভাব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া মনুষ্যকে তাহার চতুস্পার্শ্বে স্বকীয় ক্ষুদ্রায়তন কৃত্রিম অধিকার নির্ম্মাণ করিবার জন্য মত্ত করিয়া তুলিতেছে। মহান অধিকারের মাঝে মগ্ন হইতে দেয় না—কত কুটিলতা কত মলিনতা কত বাধাই হায় তাহার সম্মুখে জড় করে। এই কৃত্রিমতার স্পর্শে অধিকারের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। অকৃত্রিম অন্তরের মধ্যে অধিকার শোভা পায়। পাশব শক্তির অধিকার বেশী না প্রেমের অধিকার বেশী? প্রেমের মত অকৃত্রিম আর কি আছে? ইহার অধিকারে কেমন জীবন্ত ভাব কেমন ব্যাপকতা জাগে। ইহার সম্মুখে সহস্র বাধা উপস্থিত হউক ইহার সহজ ভাব অবাধে গতি। চৈতন্য যখন প্রথমে মহান প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সমুদয় জগতকে আপনার বলিয়া ভাবিয়াছিলেন তখন অনেকে তাঁহার নিন্দাবাদ তাঁহাকে বিদ্রূপাদি করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তিনি প্রেমের শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিশুদ্ধ অধিকারের মধ্যে বাস করিতেন। উপহাস নিন্দাবাদাদির জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া কেমন প্রশান্তভাবে পরিমলপূর্ণচিত্তে কহিতেন

"পরিবদতু যথা তথায়ং নন্থ মুখরো নবয়ং বিচারয়ামঃ।"

যথায় তথায় লোকে পরিবাদ দিউক মুখর বলিয়া আমরা তাহাদের বিচার করি না। প্রেমের অধিকারে দ্বেষ হিংসা সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহারি স্পর্শে আমাদের পবিত্রতা জন্মে। ইহাই আমাদের বাস্তবিক অধিকার। এই প্রেম হইতে আমরা যতটা দূরে পড়িব ততটা আমাদের অন্ধতা ততটা আমাদের দারিদ্র্য বিপত্তি। ইহার বাতাস যখনি হৃদয়ে আসিয়া লাগে তখনি আমরা কেমন সহজ প্রাণে "ওঁ শান্তিঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি? এই প্রেমের অধিকার ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া শত আত্মা ভ্রমপ্রমাদে অন্ধীভূত—মৃতকল্প—অশাসনে দিকভ্রষ্ট তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে মৃত্যুকে প্রধান সম্বল করিতে প্রস্তুত। তাহারা মৃত্যুর কুটিল গতি পর্য্যবেক্ষণ না

করিয়া তদ্বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিলাষ সঞ্চালন করিতে সক্ষম হয় না—দিন দিন কপট বিকট হইয়া উঠে। তাহাদের চক্ষে অধিকারের সরল জ্যোতি কিরূপে পড়িবে? অধিকারের বিশুদ্ধ মর্ম্মগ্রাহী তাহারা কিরূপে হইবে? যাহারা মৃত্যুর বক্রভাব বুঝিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে চাহে, যাহারা অনন্তের মধ্যে জীবন্ত ভাবে বিচরণ করিতে চাহে তাহাদিগকেই প্রেম আসিয়া জাগ্রতরূপে অধিকার করে। তাহারাই অধিকারের সৌন্দর্য্যটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। চরাচরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাহাদিগেরই জন্মে।

একটী সুন্দর পদার্থ কখনই তাহার সৌন্দর্য্য-বিরহিত হইবে না যদিও অন্যে তাহাকে মলিন অসুন্দর করিয়া দেখে। অনতিদূরস্থ কোন বাড়ীর সৌন্দর্য্য যখনি আমরা উন্মুক্তভাবে নিজ ঘরের মধ্যে বসিয়া দেখি তখনি সেই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অবয়ব আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ঘরের সারসি বন্ধ করিয়া তাহার মাঝখান দিয়া দেখিলে সারসির অন্তরস্থ গতি অনুসারে সেই সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইব। সারসির কাচের অন্তরটী যদি আঁকা বাঁকা ঢেউ খেলানো হয় তবে সম্মুখস্থ বাড়ীর সরল রেখাগুলি তন্মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিলে আঁকাবাঁকা ঢেউখেলানোই দেখিতে পাইব। সেইরূপ আমরা আমাদের নিজের স্বচ্ছ বিমল স্বরূপের মধ্য না দিয়া মোহমলিনতার বক্র আবরণের ভিতর দিয়া অধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সরল বিমল আকৃতি কিরূপে বুঝিতে পারিব? জড়বৎ হইয়া শিরানাড়ির মধ্যে অষ্টপ্রহর মরণ-সম্বন্ধ রচনা করিতেছি, কিরূপে অধিকারের নিগূঢ় তত্ত্ব ধ্যান করিতে সমর্থ হইব? একমাত্র প্রাণই অধিকারের নিয়ামক। আবার এই প্রাণ প্রেমের আশ্রয়েই লাভ করা যায়। আমরা যদি প্রেমের বলে বলীয়ান হইয়া তাহার প্রতি অসঙ্কোচে নির্ব্বিবাদে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে "অনধিকার চর্চ্চা" এ কথাটী উঠিয়া যাইবে। তাহার স্থানে অধিকার বিমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবে, তখন ইহার সৌগন্ধে কেনা মোহিত হইবে? এই প্রেমোন্মুখী অধিকারের রাজ্যে যদি সকলে বাস করি তবে আমাদের চতুর্দ্দিকে এই যে কলহ বিবাদ দেখা যায় ইহা কি তিষ্ঠিতে পারে? অকৃত্রিম প্রেমের সহজভাবে ডুবিতে পারিলে যে কতখানি প্রাণ পাওয়া যায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ইহার মধুময় আভাস না দেখিয়া সকলে কলুষিত হস্তে ইহার কাছে আসে—পূজা করে। সে পূজাতো ভাল নয় ক্রমে তাহা অপূজাতে গিয়া দাঁড়ায়। যতটা সাধ্য ইহার মৃত্যুময় পূজা দূর করিতে হইবে তাহা হইলে এমনি শক্তি লাভ হয় যে তদ্দ্বারা দুঃখ শোক সমুদয় তিরোহিত হইয়া যায়। এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে ইহার সুন্দর ছবি জ্বলন্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছে বুঝিয়া লইতে পারিলেই হয়। ইহার আনন্দ কল্পনা করিতে গিয়া কবি উথলিয়া ওঠেন, প্রতিকটাক্ষে অভ্রান্তির সুখময় হাস্য উপলব্ধি করিয়া পরম উপকৃত হয়েন—উপকারে ব্যস্ত হইয়া যান। ঔৎকর্ষ্য উৎসাহ আসিয়া তাঁহাকে সত্বর ঘিরিয়া ফেলে।

যে জাতি যতখানি প্রেমের আশ্রয়ে থাকিয়া অধিকারের বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ করিতে পারিয়াছে ততখানি সেই জাতির উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

এই অনন্ত অকৃত্রিম প্রেমের আশ্রয় হইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা দূরে পড়িয়া যাই। ইহাকে চিরদিন আমাদের অধিকারে রাখিতে গেলে চিরদিন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। ক্রমিকই সাধনা করিয়া যাওয়া চাই, নিমেষের তরে বিরাম যেন না হয়, তবে আমরা ক্রমিকই ইহার মধুর রহস্য উপলব্ধি করিতে থাকিব। সাধনার প্রারম্ভাবস্থায় প্রেমকে তাকে তাকে রাখিতে হইবে—প্রেমপিপাসু হইয়া প্রেমের অন্বেষণে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়াবস্থায় প্রেম থেকে থেকে আয়ত্ত হইবে। তাহা ব্যবধানযুক্ত প্রেম। তৃতীয়াবস্থায় পরে প্রেমের আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। তাহাতে অব্যবধান বর্ত্তমান।

"সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডূক প্লুতিরেবচ।
গঙ্গাস্রোত ইব খ্যাতা অধিকারা স্ত্রয়োমতাঃ॥"

এই শ্লোক অনুযায়ী প্রারম্ভাবস্থার প্রেমাধিকারকে সিংহাবলোকিত সদৃশ, দ্বিতীয়াবস্থার প্রেমাধিকারকে মণ্ডূকপ্লুতি সদৃশ, তৃতীয়াবস্থার প্রেমাধিকারকে গঙ্গা স্রোতসদৃশ কহিতে পারি। এই গঙ্গাস্রোতসদৃশ প্রেমাধিকারে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া ওঠে।

মরুভূমির আরবেরা বিদুইন নামক আরব জাতি বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল সেই এক ধাঁচে চলিতেছে। এই অবসরে কত জাতি উন্নতি অবনতির মধ্য দিয়া মহা উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে, অধিকারের সুন্দর রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে কিন্তু মরুভূমির আরবদের সে মহোন্নতি নাই। মরুর নীরস একত্বের তুল্য তাহাদের একত্ব জাগিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকাল হইতে এখনো পর্য্যন্ত প্রায় সেই এক প্রকার ভাব। একরূপ হওয়াতো খুব ভালই কারণ জগতের মাঝে একত্বই বিরাজ করিতেছে, এই বৈচিত্রের মধ্যে একত্বেরই ধ্বনি বিকাশিত। সে একত্ব সরস সরল। কিন্তু মরুভূমির আরবদের একত্ব প্রশংসাযোগ্য নয়, তাহা নীরস তাহা বাস্তবিক ধরিতে গেলে একত্বহীন অনেকত্ব। নীরস একত্ব হইতে অনধিকার চর্চ্চা জন্মায়। এই নীরস একত্বময় মরুভূমির আরবেরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধ করে কিছু মাত্র ব্যথিত হয় না। এ শুধু তাহাদের অধিকারের বিশুদ্ধ দিকে দৃষ্টি না রাখার দরুন। আধুনিক ইউরোপের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি দেখিতে পাই তাহারা অধুনাকালে অন্যাপেক্ষা অধিকারের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছে। তাই তাহাদের নিকটে স্বর্গের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হইতেছে। তাহার স্পর্শে অন্য কত জাতি আবার জাঁকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ রূপে আত্মার মহান অধিকার বুঝিয়া পার্থিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারের উপর রাজত্ব করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন—পরমেশ্বরকে করতলস্থিত আমলকবৎ লাভ করিয়া আপ্তকাম হইয়াছিলেন। প্রেমাধিকার তাঁহারদের কেমন সুন্দর রূপে ঘটিয়াছিল। আমরা মহান উন্নত হইতে চাহিলে আমাদিগকে সতত প্রেমের অধিকারের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। ইহা বিনা আমাদের অন্য গতি নাই। ইহার দ্বারা সমুদয় কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে অথচ নীরবে সম্পন্ন হইয়া যায়। এই প্রেমেরই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গ্রহের পশ্চাতে গ্রহ ঘুরিতেছে অথচ কিছু মাত্র কোলাহল বিশৃঙ্খলতা নাই; কেমন নিঃশব্দে নীরবে কার্য্য সমাধা হইয়া যাই-

তেছে। যদি সমাজে আসিয়া পরমেশ্বরকেই লাভ করিবার সাধ থাকে তবে আমাদের ব্যক্তিগত দোষ গুণ ব্যক্তিগত ত্রুটী লইয়া মনে মনে কোলাহল না করিয়া নীরবতা অভ্যাস করা শ্রেয়। এই নীরবতা ছাড়িয়া হট্টগোল হুজুকে মাতিয়া থাকিলে প্রেমের মাধুর্য্য আমরা হারাইয়া ফেলি সঙ্গে সঙ্গে সেই মহান অনন্ত হইতে দূরে পড়িয়া যাই। একটী হিন্দুস্থানি গানে আছে "পরম পদ গোঙাহো য়্যাসে পাওয়ে। কর নহি চাল পগনহি হাল বিনে রসনা গুণ গাওয়ে। যদি পরম পদ পাইতে অভিলাষ হয় তবে মূক হও। হাত চলিবে না পা চলিবে না বিনা রসনায় তাঁহার গুণ গাও। অসীমের মহিমা বুঝিতে গেলে এইরূপ নীরব পথ অবলম্বন করিয়া মৌনী হইয়া প্রেমের সূক্ষ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে।

"সংত্যজ্য বাসনাং মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্।

বাসনা ত্যাগ করিয়া মৌনভাব অবলম্বন না করিলে কখনো উত্তম পদ লাভ হয় না। মৌনী হইয়া ক্রমিকই আমাদের প্রেমের অধিকারের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে তবে আমাদের রক্ষা। আমাদের ঝঞ্ঝাট ভয়ের কারণ কিছুই রহিবে না। আমরা নির্ভীক সাহসী হইতে পারিব। আমরা এমনি পরাধীন এমনি দুর্ব্বল যে, আমাদের স্বদেশ আমাদের জন্মভূমি অথচ তবু আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। ইহা হইতে দারিদ্র্য দুর্দশা আর কি হইতে পারে? এ দারিদ্র্য এ দুর্দশাও ঘুচিবে যদি আমরা একবার প্রেম অধিকার করিয়া দীপ্তিমান হই। প্রেমের পথ দিয়া ত্রিকালজ্ঞের আনন্দ ঘোষণা করিয়া বেড়াই। ইহাই আমাদের কাজ। ইহাই আমাদের সাজ।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের অন্তরে তোমার প্রেম তোমার সহবাসের যে মহান অধিকার দিয়া আমাদের প্রতি তোমার অসীম করুণার পরিচয় দিয়াছ তাহা ভুলিয়া কেন আমরা এই সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে জড়িত হইয়া পড়ি, রাশি রাশি হীনতা ক্ষীণতা আসিয়া আমাদের ধ্বংস করিবার উপক্রম করে। ইহা হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর। তুমিই মুক্তিদাতা অদ্বিতীয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রী হিতেন্দ্র।

নীতি।

ধর্ম্মের দুইটি দিক, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক। মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ লৌকিক; মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ আধ্যাত্মিক। মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের এই সম্বন্ধের অপর নাম নৈতিক যোগ। এবং যে নিয়ম অনুসারে মনুষ্যেরা আপনারদের মধ্যে ব্যবহার নিয়মিত করে তাহার নাম নীতি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপাসনার স্বাভাবিকত্ব সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হইলেও যেমন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট যোগে আবদ্ধ হওয়া মনুষ্যের নিজ নিজ যত্ন চেষ্টা সাধন তপস্যা সাপেক্ষ, তেমনি সত্য দয়া ক্ষমা মৈত্রী প্রভৃতি মানসিক সুকোমল ভাব হৃদয়-ক্ষেত্রের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস হইলেও উহারদের উৎকর্ষ বিধান মনুষ্যের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফল। মনুষ্য এখানে আসিয়া যাহা কিছু সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও ইহাই ধর্ম্ম সাধনের তাবৎ নহে। আমারদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা অনুষ্ঠানে তৎপরতা চাই। একদিকে আমরা সামাজিক জীব

আর এক দিকে আধ্যাত্মিক জীব। আমরা যতদূর সামাজিক ততদূর আমাদিগকে ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া পাত্র বিশেষে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া মৈত্রী ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে, অপরের সুখশান্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইবে, অসত্য পরদ্রোহ পরপীড়ন, চৌর্য্য নিষ্ঠুরতা ইন্দ্রিয়লৌল্য, ক্রোধ প্রতিহিংসা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার যতদূর আধ্যাত্মিক জীব সংসারের অনিত্যতা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া ঈশ্বরকে গতি মুক্তির নিদানভূত জানিয়া ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভের জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কাতর প্রাণে বিমল হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, সম্পদে বিপদে স্থির থাকিয়া সেই ধ্রুবতারার উপর অনিমেষ আঁখি স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে অক্ষয় যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। জীবনকে গৃহী সন্ন্যাসীর অভিনয়ক্ষেত্র করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের পক্ষে যার পর নাই উচ্চ লক্ষ্য, উন্নততম আদর্শ। এই আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল লক্ষ্য অভাবে সহজেই উদ্দাম হইয়া মনুষ্যকে বিপদগামী করে। আবার বিশ্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানের এমনই গূঢ়তম সম্বন্ধ যে কার্য্যক্ষেত্রে বিলক্ষণ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অগ্রসর হইতে না পারিলে বিপদপাতের সমধিক সম্ভাবনা। এই জন্যই ধর্ম্মগতপ্রাণ মহানুভব প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া মনুষ্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াও স্বার্থপরতা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা অযথা ক্রোধের নিকট ধর্ম্মকে বলিদান দিতে সময় বিশেষে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। একদিকে ঈশ্বরসাধন যেমনই কঠোর, নীতিসাধন তেমনই দৃঢ়তা তিতিক্ষা ও স্থৈর্য্যসাপেক্ষ। সংক্ষেপতঃ নৈতিক উন্নতিই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি, এবং ইহাই আধ্যাত্মিক বললাভের পরিচায়ক। চরিত্র সংগঠনের উপরেই ঈশ্বরলাভের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

ন্যায় অন্যায় জ্ঞান মনুষ্যের সহজ জ্ঞান সম্ভূত হইলেও কাল ও দেশ বিশেষে কেন যে কোন এক গর্হিত কর্ম্ম আদরের চক্ষে পরিলক্ষিত হয়, আবার কোন এক শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ঘৃণার সহিত সমালোচিত হয়, এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে; নীতির মূলমন্ত্রে সকলে সমান ভাবে দীক্ষিত হইয়াও কেন যে বিসদৃশ ভাবের পরিচয় দেয়, ইহার রহস্য উদ্ভেদ বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমারদের বিবেচ্য বিষয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে অনেকটা বিষদ হইবার সম্ভাবনা (১) নীতিজ্ঞানের মূল কোথায় (২) সকল জাতির নীতি-জ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর ঐক্য আছে (৩) কার্য্য ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বিবেচনার বিভিন্নতা কোথা হইতে আইসে।

১। নীতি জ্ঞানের মূল কোথায়। সদসৎ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই সহজ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। লোকে কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় আপনা হইতেই বুঝিতে পারেন। ন্যায় অন্যায় বুঝিতে কোনরূপ শিক্ষার আবশ্যক করে না। বালকের জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে কার্য্যের হিতাহিতত্ব বুঝিতে থাকে। বিনা কারণে পিতামাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে বা অন্যায় কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইলে অমনি তাহার অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হয়। অন্যায় রূপে প্রহার করিলে অমনি সে বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। মিথ্যা কখন

তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সরলতা পবিত্রতা তাহার প্রকৃতির মাধুর্য্য। নরহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা চৌর্য্য অপহরণ প্রবঞ্চনা এই সকল কার্য্য চিরকালই ঘৃণার চক্ষে পরিলক্ষিত হয়। নীতিবিরোধী কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানে তাহার চিরঘৃণা। তবে যে স্থলবিশেষে তাদৃশ ঘৃণা উৎপাদিত হয় না তাহার যে অন্য কারণ আছে তাহা পরে দর্শিত হইবে। আমরা যদি বাল্য কাল হইতে কাহাকে শিখাইতে থাকি যে চৌর্য্য প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা দস্যুবৃত্তি বাস্তবিক হিতকর, আর দরিদ্রকে দান, অসহায়কে সাহায্যকরণ, যারপর নাই নীতিবিরুদ্ধ, তবে এরূপ শিক্ষা কোন রূপেই অন্তরের ভিতর হইতে সায় প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্য এরূপ শিক্ষায় কখনই আপনাকে নিয়মিত করিতে পারেন না। এরূপ শিক্ষায় না তিনি ভিতরের অনুমোদন পান, না বহির্জগতের সহানুভূতি পান। প্রতি অহিতাচরণে তাঁহাকে অন্তরে কোন এক অজানিত প্রভুর কশাঘাত সহ্য করিতে হইবেই হইবে। অনুতাপের গ্লানি সেই নরকাগ্নি হইতে কোন মতেই তাঁহার পরিত্রাণ নাই। এই প্রভুর নাম হিতাহিত জ্ঞান, ইহাই জড় প্রকৃতির রাজা ; হস্তপদাদি ইহার সৈন্যদল, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ইহার একান্ত সেবক ও অধীন। এই হিতাহিত জ্ঞানই মনুষ্যহৃদয়ে সারবান ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস যার পর নাই ধর্ম্মানুগত ও ঈশ্বরানুগত বিশ্বাস।

উপরে যেমন হিতাহিত জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইল কিন্তু ইহাই যে একমাত্র অবিসম্বাদী মত তাহা নহে। ন্যায় অন্যায় জ্ঞানবিরোধী দলের মতে সহজ স্বাভাবিক আশৈশব ঈশ্বরদত্ত কোন এক মানসিক ক্ষমতা প্রসূত নহে। তাঁহারদের মতে এরূপ কোন রূঢ় বৃত্তি নাই ; হিতাহিত জ্ঞান কয়েকটি মানসিক ভাবের সংঘাতে উৎপন্ন। কেহ বলেন ঈদৃশ জ্ঞানের ভিত্তিমূলে মনুষ্যের ভয়, কুসংস্কার, দেশীয় প্রচলিত রীতি, ইত্যাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ বলেন ইহা ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি, প্রচলিত মতামত ও রাজদণ্ড দ্বারা নিয়মিত সহানুভূতি ও অন্যান্য ভাবের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন সাধারণের সুখবৃদ্ধির ইচ্ছা ও মানসিক কোমল ভাবের উত্তেজনায় মনুষ্য ন্যায্য কর্ম্মে অগ্রসর হয়। কেহ বা বলেন যাহা সুখ বৃদ্ধি করে তাহাই নীতি তাহার বিপরীত দূর্নীতি, কেহ বা আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলেন যাহা আমার পক্ষে সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে যাহা তোমার সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে, কিন্তু যাহা বহু সংখ্যক লোকের বহু কল্যাণপ্রদ তাহাই নীতি তদ্বিরীত দুর্নীতি। এক হিতাহিত জ্ঞানাত্মক স্বতন্ত্র মানসিক বৃত্তির সত্ত্বা অস্বীকার করিতে গিয়া এরূপ নানা মতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতই কেন যৌগিক উপাদানে ইহার কলেবর গঠিত করিবার প্রয়াস পাওয়া হউক না, প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের তর্কতরঙ্গের মধ্যে তাঁহারদের যুক্তিতেও প্রকৃত বিষয়ে এরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হয় যে তাহাতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। শেষোক্ত মতের এক একটিকে হইয়া তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে তাহারদের বিরুদ্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে উপরিউক্ত মতের কোনটিই মনুষ্যের দায়িত্ব ও বাধ্যতা প্রমাণ করিতে পারে না। যদি ন্যায় অন্যায় বিবেচনা

আমার উপর নির্ভর করে তবে কেন ন্যায়ের ব্যভিচারে ভিতরের তাড়না সহ্য করিতে হয়। পিতামাতাকে ভক্তি করিতে তুমি বাধ্য, আর্ত্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে তুমি বাধ্য, সময় বিশেষে আপনার জীবনের উপর কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া অপরকে রক্ষা করিবার জন্য ভিতর হইতে যে দুর্দ্দম্য বল আইসে, কই আমরাত ইচ্ছা করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। অন্যায় কার্য্য করিলে কোথা হইতে বা অনুতাপ আইসে?

(খ) যদি সুখ ন্যায় কার্য্যের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে সুখ আমাকে আকর্ষণ করিতে পারে, আমাদিগকে বাধ্য করিতে পারে না, আমাদিগকে শাসন করিতে পারে না। সুখ আমাদিগকে কেন ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি করে ইহারও সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বিশেষতঃ সুখও নানা প্রকারের, কতকগুলি বা উচ্চ অঙ্গের কতকগুলি বা নিম্ন অঙ্গের। কার্য্যক্ষেত্রে কোন্ প্রকার সুখ কখন বা গ্রাহ্য কখন বা ত্যজ্য তাহা কে নির্ণয় করিয়া দিবে। আবার সুখের মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাই যে কতকগুলি সুখ মনুষ্যের সচেষ্ট অবস্থার কতকগুলি নিশ্চেষ্ট অবস্থার। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিচালনায় যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা সচেষ্ট অবস্থার সুখ। স্নিগ্ধ বায়ু সেবন মূল্যবান পদার্থ ও ধন ঐশ্বর্য্যের উপভোগে যে সুখ হয় তাহা আবার অন্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে সুখ মাত্রেই আমারদের ন্যায় কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারে না। প্রত্যুত তাহারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির চালনা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা শক্তি পরিচালনার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যায় না, কিন্তু সহচর অনুচর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে।

(গ) মনে কর সুখই যেন ন্যায্য কর্ম্মের নিয়ামক হইল, কিন্তু আমি ত সংসারী জীব, আমি কাহার সুখ দেখিব, আমার না পরের। কখন্ বা আমার সুখ দেখিব কখন বা পরের সুখ দেখিব এ সন্ধান আমাকে কে বলিয়া দিবে। যদি বহুল অংশ লোকের বহুল পরিমাণে সুখ দীপশলাকা হস্তে আমার পুরোবর্ত্তী হয়, তবে অন্ধকার বিদ্ধস্ত না হইয়া বরং তাহার গাঢ়তা শত গুণ বর্দ্ধিত হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিকর্ম্মের প্রারম্ভে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে "বহুল সংখ্যক লোকের বহুল পরিমাণে সুখ" তর্ক শাস্ত্রের এ জটিলতম প্রশ্নের কে মীমাংসা করিয়া দিবে। আমরা ত কার্য্য করিবার সময় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় আশৈশব ন্যায় অন্যায় আপনা হইতে বুঝিতেছি; বাল্যে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে যে বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, যৌবনে তর্কশাস্ত্রের সমূহ আলোচনার পর ত আপনাকে ভ্রান্ত বুঝিতেছি না। ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে করুক, কিন্তু সদসৎ জ্ঞান যে জ্বলন্ত অক্ষরে আমারদের অন্তরে চিহ্নিত রহিয়াছে, কখনই তাহার ক্ষয় দেখিতেছি না।

(ঘ) আমরা দেখিতেছি নীতি-অনুমোদিত কার্য্য সকলেরই অনুষ্ঠানে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়; কিন্তু যাহাতে সুখ হয় তাহাই ন্যায্য নহে। সুতরাং সুখ ও ন্যায় পরস্পরের প্রকাশক নহে। সুখের ক্ষেত্র ন্যায়ের অপেক্ষা প্রশস্ততর, সুতরাং সুখ ন্যায় কর্ম্মের পরিমাপক হইতে পারে না। সুখের কষ্টি-

প্রস্তরে ন্যায়ের পরীক্ষা চলিতে পারে না। আবার যাহাতে দুঃখ জন্মে তাহাই অন্যায্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এমন কোন কার্য্য নাই দুঃখ যাহার উদ্দেশ্য। দুঃখ পাইব এই মানসে কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। মনুষ্যের অবিবেকিতা দোষে দুঃখ জন্মে। ইচ্ছা করিয়া কেহ আপনার মস্তকে দুঃখ আনয়ন করে না। আবার এমন কতকগুলি দুঃখ আছে, সুখ যাহার মর্ম্মে রহিয়াছে। শরীরে ব্রণ হইল, চিকিৎসক আসিয়া তাহাতে অস্ত্র-প্রয়োগ করিলেন, রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এই দুঃখের মধ্যে অন্যায় কোথায়। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সুখও ন্যায়ের নিয়ামক নহে, দুঃখও অন্যায়ের প্রতিরূপ নহে।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৴১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাক মাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

আগামী ৪ঠা ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রীলালবেহারি দে।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫২৪৸৴০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৮৭৮॥৶১৫
সমষ্টি	৩৪০৩॥ ১৫
ব্যয় ...	৭৫১ ৵০
স্থিত	২৬৫২।৵১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫৪।৵০
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
" " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৩১।৵০
	৫৪।৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯২॥৴০
পুস্তকালয় ...	১২৸৴০
যন্ত্রালয় ..	১৬৬।৵১০
গচ্ছিত ...	৮৮৸৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৯৸০
সমষ্টি	৫২৪৸৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৬০৸ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৯৸৶০
পুস্তকালয়	৩৮৸৴০
যন্ত্রালয় ...	২০৩৸৴১৫
গচ্ছিত	৯১॥৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৵১০
দাতব্য	১৬৲
সমষ্টি ...	৭৫১৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত মাসের "আত্মা ও পরমাত্মা" শিরস্ক প্রবন্ধে তৃতীয় পারাগ্রাফ নবম পংক্তিতে "আমি আছি" এবং "আমি স্রষ্ট" ইহাই জীবাত্মার নির্দ্দেশ, এইরূপ হইবে; ত্রয়োবিংশ পংক্তি "আত্মাকে" ইহার স্থানে "জীবাত্মাকে" হইবে; পঞ্চবিংশ পংক্তি "তিনি" ইহার স্থানে "যিনি" হইবে।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪২ সংখ্যা　　　　১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वं नियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আত্মশক্তি।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজি পণ্ডিত বলিয়াছেন—জ্ঞানই শক্তি;—কিন্তু কার্য্যতঃ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলের পক্ষে নহে; যাঁহারা জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে জানেন তাঁহাদেরই জ্ঞান বিশিষ্টরূপে শক্তি নামের যোগ্য। মনে কর—দুই ব্যক্তিই রসায়ণ বিদ্যায় সুপণ্ডিত; তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি উক্ত বিদ্যার সাহায্যে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে জানেন, আর এক ব্যক্তি সে বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ; রসায়ণ-জ্ঞান দুই ব্যক্তিরই সমান—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রসায়ণ-জ্ঞান শক্তি-নামের যোগ্য, শেষোক্ত ব্যক্তির রসায়ণ-জ্ঞান শুদ্ধ কেবল জ্ঞান মাত্রই সার। অতএব, সাধারণতঃ সকল জ্ঞানই যে, শক্তি, তাহা নহে; বিশেষ এক-জাতীয় জ্ঞান আছে—তাহাই শক্তি নামের যোগ্য, কি? না উপায়-জ্ঞান; উপায়-জ্ঞান—অর্থাৎ জ্ঞানকে কিরূপে কার্য্যে খাটাইতে হয় তদ্বিষয়ক জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞানই শক্তি।

জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে হইলে জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। বিদ্যা-শিক্ষার সময় জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানদাতা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা দুয়ের মধ্যে এ-পিঠ ও-পিঠ সম্বন্ধ। বিদ্যার্থীর নিকটে গুরুই জ্ঞান মূর্ত্তিমান্। কিন্তু গুরু কেবল জ্ঞানের গুণেই গুরু—এই জন্য জ্ঞান গুরু অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধেয়। তবে, বালকের পঠদ্দশায়—জ্ঞান যে কি বস্তু—সে তাহা জানে না; সুতরাং তখন জ্ঞান তাহার নিকটে কিছুই নহে—গুরুই তাহার নিকটে জীবন্ত জ্ঞান। বিদ্যার্থী ব্যক্তি যতই জ্ঞান-লাভে কৃতকার্য্য হইতে থাকেন, ততই তাঁহার গুরু-ভক্তি বাহিরের গুরু হইতে অন্তরের গুরুর প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইতে থাকে; ইতিপূর্ব্বে গুরুর প্রতি তাঁহার যতখানি শ্রদ্ধা ছিল, জ্ঞানোপার্জ্জনের পর জ্ঞানের প্রতি তাঁহার ততোধিক শ্রদ্ধা জন্মে। জ্ঞানের প্রতি যাঁহার যত শ্রদ্ধা বেশী—জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে তাঁহার তত উৎসাহ বেশী। কলম্বস্, নিউটন, প্রভৃতি মহাত্মাদিগের একদিকে যেমন জ্ঞানের প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল, আর এক দিকে তেমনি জ্ঞানকে কার্য্যে খাটা-

ইবার জন্য অসামান্য উৎসাহ ছিল। এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ উৎসাহী পুরুষেরা জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়া যা'ন, তাহার পরে তাঁহাদের অনুপন্থীরা তদনুসারে পুনঃপুনঃ কার্য্য করিয়া অভীষ্ট কার্য্যে অসাধারণ নিপুণতা লাভ করেন। এইরূপে জ্ঞানের সহিত যখন কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হয়, তখনই জ্ঞান বিশিষ্টরূপে শক্তি-নামের যোগ্য হয়।

অধুনাতন কালের প্রধান একটি ভ্রম এই যে, বিজ্ঞানই কেবল জ্ঞান-নামের যোগ্য, বিশুদ্ধ-জ্ঞান-রূপী যে আত্মা, তাহা কিছুই নহে। ইহাঁদের মুখের কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, ইহাঁরা বিজ্ঞানের সবিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু পক্ষপাতকে আমরা অত্যন্ত ডরাই—এজন্য পারৎপক্ষে আমরা তাহার ত্রিসীমা মাড়াই না। বিজ্ঞানের পক্ষে হইয়া আত্মাকে নীচু করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না—আত্মার পক্ষে হইয়া বিজ্ঞানকে নীচু করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এখানে এই সত্যটি সংস্থাপন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, বিজ্ঞানের সহিত কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হইয়া যেমন সাংসারিক শক্তি পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত, অথবা যাহা একই কথা—আত্মার সহিত, কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হইয়া আত্ম-শক্তি পরিস্ফুট হয়।

ফরাসীস্ বিজ্ঞান-বেত্তা কমটি মনুষ্যত্ব-নামক একটা আব্ছায়া মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সে মনুষ্যত্ব কতকগুলা মৃত মনুষ্যের সমষ্টি—তাহার শক্তি কি আর থাকিবে? কিন্তু যদি জাগ্রত জীবন্ত মনুষ্যত্ব দেখিতে চাও তবে তাহা তোমার অন্তরে বিরাজমান; প্রতি জনের বিশুদ্ধ জ্ঞানই—প্রতি জনের আত্মাই—জীবন্ত মনুষ্যত্ব; কম্‌টির ও-মনুষ্যত্ব এবং আমাদের এ-মনুষ্যত্ব দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কম্‌টির মনুষ্যত্ব কি রূপ? না যেমন সেনার সেনাত্ব; সেনারাই যুদ্ধ করে—সেনাত্ব কিছুই করে না। আমাদের মনুষ্যত্ব কি রূপ? না যেমন সেনার সেনাপতি; সেনাপতির অধ্যক্ষতা ব্যতীত সেনা যুদ্ধ করিতে পারে না—আত্মার অধ্যক্ষতা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে পারে না। আমাদের অভ্যন্তরস্থিত বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই আমরা বলি—আত্মা; আত্মাই জীবন্ত মনুষ্যত্ব—আত্মাই পরমাত্মার অনুকৃতি। ইহা যেমন সুনিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইতে পারেন তিনি তত সাংসারিক শক্তি উপার্জ্জন করেন, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান-রূপী আত্মাকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইতে পারেন তিনি তত আধ্যাত্মিক শক্তি উপার্জ্জন করেন।

জাহাজ চালাইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে সমুদ্র-পথের একটি সমীচীন আদর্শ-লিপি প্রস্তুত করা আবশ্যক। সেইরূপ বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে সমীচীন একটি আদর্শ অবলম্বন করা আবশ্যক। পরমাত্মাই আত্মার সমীচীন আদর্শ। সমুদ্র-পথও যেমন নির্জীব; তাহার আদর্শ-লিপিও তেমনি নির্জীব, কিন্তু পরমাত্মা জীবন্ত আত্মার জাগ্রত জীবন্ত আদর্শ। জীবন্ত শরীরের অভ্যন্তরেই আমরা জীবন্ত মনুষ্যকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, সেইরূপ জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরেই আমরা জীবন্ত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। একজন মনুষ্যকে চিন্তা করা স্বতন্ত্র এবং তাহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা স্বতন্ত্র,—তাহাকে

সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে তাহার জীবন্ত শরীরের অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়; তেমনি, পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহাকে জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়। সকলেই আমরা পরমাত্মাকে আত্মার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি; কেবল সে বৃত্তান্তটির প্রতি আমরা যথোচিত মনোনিবেশ করি না বলিয়া অভীষ্ট ফল-লাভে বঞ্চিত হই। পিঞ্জরস্থিত পক্ষী আহারান্তে চাহিয়া দেখে যে, তাহার চতুর্দ্দিকে আকাশ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাই সে পিঞ্জরের যন্ত্রণা অনুভব করে; কিন্তু সে যদি অষ্ট প্রহর কেবল আহার পানেই নিযুক্ত থাকিত তবে পিঞ্জরে থাকিয়াই সে স্বর্গভোগ করিত। সেইরূপ পরম আনন্দধামের প্রতি আমাদের লক্ষ রহিয়াছে বলিয়াই আমরা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করি; জ্বালা-যন্ত্রণার অর্থই এই যে, যে আনন্দের প্রতি আমাদের লক্ষ রহিয়াছে, সে আনন্দকে আমরা সমুচিত পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা যদি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে উন্মেষিত না হইতেন,তবে আমরা পশুদিগের ন্যায় যাহাতে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। আমাদের একদিকে দুঃখ-ক্লেশময় সংসার, আর-এক দিকে পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। সংসারের এই যে, দুঃখ শোক জরা ব্যাধি, ইহার একটা উল্টা পিট রহিয়াছে—তাহাতে আর ভুল নাই; তাহা কি? না আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা আমাদের সমস্ত দুঃখ-শোক জরা-ব্যাধি পাপতাপের শান্তি-সুধা; তিনি আমাদের আত্মার সমগ্র অভাবের পরিপূর্ত্তি এবং পরিশান্তি। কিন্তু সেই আনন্দধামে মনকে নিবিষ্ট করিতে শিক্ষা করা প্রয়োজন। সারথী যেমন অশ্বের গ্রীবা থাবড়াইয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে শীতল করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে অশ্বশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়, সেইরূপ অবসর-ক্রমে মনকে প্রবোধ-বাক্যে শীতল করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে অন্তরতর অন্তরতম আনন্দ-ধামে ফিরাইয়া আনা সাধকের পক্ষে অতীব আবশ্যক। ইহাতে আত্মার মালিন্য ঘুচিয়া যায়, আত্মাতে শান্তির উদ্রেক হয়, ও আত্মার কার্য্য-শক্তি দ্বিগুণিত হয়।

এইরূপে পরমাত্মার আনন্দ-রস-পানে মন সুপ্রসন্ন প্রশান্ত এবং সবল হইলে অতঃপর তাহাকে সাংসারিক কর্ত্তব্য-সাধনে নিযুক্ত করা আবশ্যক। যাঁহারা এইরূপে কার্য্য করেন তাঁহারা ঈশ্বরের হইয়াই কার্য্য করেন—এইজন্য তাঁহাদের মন অল্প কিছুতে বিচলিত হয় না। এইরূপ করিয়া সাধকের যখন কর্ত্তব্য-সাধনে যথোচিত নিপুণতা জন্মে, তখনই তাঁহার বিশুদ্ধ ধী-শক্তি কার্য্য-শক্তিতে পরিণত হয়, তখন তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান জ্ঞান-মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—তাহা একটা প্রবল-পরাক্রম শক্তি হইয়া উঠে। এইরূপ শক্তি-সমন্বিত বিশুদ্ধ জ্ঞানই সমগ্র আত্মা।

নিবৃত্তি।

আত্মার তৃপ্তি-সাধন নিজের দ্বারা যেমন হয় বাহ্যবস্তুর সাহায্যে তেমন হয় না। কিন্তু আমাদের এমনি থেকে থেকে ভুল হয় যে নিজের সুখানুসন্ধান করিতে বাহিরেই ঘুরি, বাহিরের সংস্পর্শজনিত মোহে মনকে কতরূপে তৃপ্তি উপভোগ করাইবার জন্য ব্যস্ত হই, চেষ্টা পদে পদে বিফল হইয়া যায় কারণ জ্ঞান-স্বরূপের সুশীতল

ছায়া ভিন্ন আত্মার আর কোথাও শান্তি নাই ; সেইখানে বসিয়া সে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে চায়। সেই বলেই আত্মা মলিন মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মায় নিলীন রাখিতে চায়।

অগ্নিকণা নীরস দ্রব্যরাশিতে পতিত হইলে চকিতের মধ্যে মহাঅগ্নিরূপ ধারণ করত শেষে ভস্মাকারে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আমাদের প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া ক্ষণস্থায়ী মহাচমকে মাতিয়া ওঠে শেষে একেবারে অধঃপতন—কাজেই নিবৃত্তি। এরূপ নিবৃত্তি নিবৃত্তিই নহে। যেহেতু অবস্থা আমাদিগকে ঘাড় ধরিয়া নিবৃত্তিতে আনিল, আমরা স্বাধীন ভাবে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। স্বাধীন ভাবে যে নিবৃত্তি তাহাই প্রকৃত নিবৃত্তি, তাহাই বাস্তবিক জ্ঞানের লক্ষণ। আত্মা ইহাতেই ভাল থাকে। ইহাতেই আত্মার ধৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য, নিবৃত্তিকে আমরা ভালরূপ অভ্যাস করিতে সমর্থ হইলে জগতের কি না উপকার আমাদের কর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে? সকল দেশেরই ধর্ম্মের মধ্যে ইহার পবিত্র মাধুর্য্য গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা সহজে কাহারো চক্ষে পতিত হয় না। যাঁহারা সাধনপ্রিয় সজ্জন তাঁহাদেরই জ্ঞানে নিবৃত্তির সূক্ষ্ম মাধুর্য্য ধরা দেয়। নিবৃত্তি রেবতু গরীয়সী নিবৃত্তিই গরীয়সী। ইহুদী গ্রীক আরবী পারসী প্রভৃতি কত জাতির মধ্যে নিবৃত্তির চর্চ্চা হইয়াছে। ইহুদী-ধর্ম্মে একটী অতি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই "মিস্না ডুমা মাস্সা" 'মিস্সা'র অর্থ শ্রবণ 'ডুমা'র অর্থ নীরব 'মাস্না'র অর্থ ধৈর্য্য। অর্থাৎ নীরব হইয়া সব শ্রবণ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি যেন না হয়। ইহাতে কতখানি নিবৃত্তির চর্চ্চা হইল! গ্রীসে জেনোইষ্টেরা কহিত "সহ্য কর এবং সংযত থাক।" কিন্তু আমাদের দেশে যেমন নিবৃত্তির চর্চ্চা হইয়া গিয়াছে এমন কোথাও হয় নাই। সংস্কৃত কাব্য নাটক বেদ বেদান্ত সমুদয়ের মধ্যে কেবল নিবৃত্তিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আমাদের এক মহাভারতে এক রামায়ণে কেমন নিবৃত্তির চরম শিক্ষা লাভ করা যায়। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎসুখং। কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ॥" যিনি সন্তুষ্টচিত্ত নিরীহ এবং স্বীয় আত্মাতে রমণ করেন তাঁহার যে সুখ সে সুখ যাহারা কামলোভের বশে বিষয়-রাজ্যে ধাবমান হইতেছে তাহাদের কোথায়? সনৎকুমার ঋষিমণ্ডলীকে উপদেশ দিবার সময় কহিয়াছিলেন "নাস্তিরাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখং" বিষয়াশক্তি তুল্য দুঃখ নাই ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। এইরূপ আমরা নিবৃত্তিপূর্ণ ঋষিদের দেখিলে কি আরাম পাই! এই এমন নিবৃত্তি-সম্পন্ন দেশে থাকিয়া যদি আমরা বিষয়-মোহ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে না সক্ষম হইলাম—নিবৃত্ত থাকিয়া পরমাত্মার পবিত্র সহবাস না পাইলাম তবে আমরা অতিশয় মন্দভাগ্য। আমাদের অতিশয় লজ্জার বিষয়।

হে পরমাত্মন্। তুমি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া এই পবিত্র নিবৃত্তি অহরহঃ শিক্ষা দাও তাহাহইলেই আমরা তোমার আদেশ পালনে কৃতকার্য্য হইব, তোমার পথের পথিক হইতে পারিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীহিতেন্দ্র

—

নীতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬) পরিশেষে যদি রাজনিয়ম অথবা জনসাধারণের নিন্দাবাদ ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে সভ্য সমাজের সামাজিক নিয়মাবলী (etiquette) নীতির অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু কই সামাজিক নিয়মভঙ্গের জন্য মনের মধ্যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের ন্যায় অনুতাপ আইসে না। নীতি মনুষ্যের সৃষ্ট হইলে সামাজিক নিয়মাবলীর সহিত ন্যায্য কর্ম্মের ঐক্য অনুভূত হইত। লোকে কাহা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইয়া আপনা হইতে ন্যায্য কর্ম্মে রত হয়। নীতি মনুষ্যের সৃষ্টি হইলে, সুখ ইহার প্রবর্ত্তক হইলে অথবা অন্যান্য উপাদানে নীতিজ্ঞান সংগঠিত হইলে পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নীতির শ্রীবৃদ্ধি ও তারতম্য হইত, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে আপনাকে নীতির হস্ত হইতে অব্যাহতি দিতে পারিতেন। উল্লিখিত যুক্তি পরম্পরার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক হিতাহিতজ্ঞানপ্রসূত। বালকের জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে ইহার উদ্দীপন হয়। সকল দেশের সকল মনুষ্যের অন্তরে এই জ্ঞান জাগরূক রহিয়াছে।

২। সকল দেশের সকল মনুষ্যেরই নীতির মূল সত্যে সমান বিশ্বাস রহিয়াছে। যে দেশের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা কর পরস্বাপহরণ উচিত কি না, অবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে এক বাক্যে বলিবে কখনই না। সত্য কথা কহা উচিত কি না, উত্তরে বলিবে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরত্ন আর কি আছে। কিন্তু এই মূল সত্যে সমান বিশ্বাস থাকিলেও যদি আবার পরক্ষণে জিজ্ঞাসা কর, শত্রুর ধন অপহরণ করা উচিত কি না, কেহ বা মস্তক কণ্ডূয়ন করিয়া বলিবেন "উচিত" কেহ বলিবে "না"। উত্তরের বৈষম্যে ইহা বলা যাইতে পারে যে স্বার্থের নির্ম্মোক ধারণ করিয়া উত্তর দুইটি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মূল সত্যে অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উহাতে মানসিক দুষ্প্রবৃত্তির ছায়া পতিত হইয়া উহাকে ম্লান করিয়া ফেলে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ণসত্যের মর্য্যাদার কোনরূপ হানি হয় না। এই জন্য পূর্ণ সত্যে ও ব্যবহারে, বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে চিরকাল সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, এবং এরূপ সংগ্রাম যার পর নাই দুর্নিবার। মনুষ্য একে অপূর্ণ দুর্ব্বল জীব, যাহারদের সঙ্গে ব্যবহার করিবে তাহারাও ঐরূপ। অপূর্ণ বৃত্তের মধ্যগত হইয়া অপূর্ণ দুর্ব্বল জীব কেমন করিয়া পূর্ণসত্য সকল সময়ে জীবনে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবে।

অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যগণ আপনার আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, এমন একটু অবসর নাই, এমন অনুকূল ক্ষেত্র নাই যে তাহারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সকলের পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। ক্রমে সভ্যতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের পরিবর্ত্তে অর্থের ব্যবহার সমাজে প্রবেশ লাভ করে, তখন স্বচ্ছন্দে শরীর রক্ষা করিয়াও অন্যান্য শক্তি পরিচালনার যথেষ্ট সময় থাকে। সুতরাং ষোড়শকল চন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরপ্রদত্ত বৃত্তি সকল পূর্ণভাব ধারণ করিতে থাকে। এই জন্য অসভ্যজাতি অপেক্ষা সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে নীতিসম্মত কার্য্যের বহুলতম বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ অন্তর্দ্দেশ অন্বেষণ করিলে সুসভ্য অসভ্য

উভয়ের মধ্যেই নীতির মূল মন্ত্রে সমান বিশ্বাস দেখা যায়।

৩। কার্য্যক্ষেত্রে নীতির বিলক্ষণ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও যদি তাহার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তবে দেখিতে পাই যে মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে নীতির মূল-মন্ত্রের সত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন এক কার্য্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে আমরা সেই আদর্শের সহিত কার্য্য বিশেষ মিলাইয়া লই। এই মিলনের জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। আমারদের প্রত্যেক বিশেষ কার্য্য সেই মূল আদর্শের অন্তর্ভূত হইয়া প্রকাশ পায়। "রামকে মারিব কি না" এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই নীতির মূলমন্ত্র অন্তর্দ্দেশ হইতে বলেন যে "নিরপরাধে কাহাকে প্রহার করা উচিত নয়।"

মনুষ্যের কার্য্যমাত্রই যে নৈতিক কর্ম্ম তাহা নহে। তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা শারীরিক মানসিক ও নৈতিক। ব্যায়াম ভ্রমণ সন্তরণ শারীরিক ; মনোযোগ তর্ক স্মৃতি ইত্যাদি মানসিক কর্ম্মের অন্তর্ভূত। আবার শারীরিক ও মানসিক কার্য্য অবস্থাভেদে নৈতিক কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। পোত নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া যদি সন্তরণ করিয়া পোতারোহিদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাই তবে তাহা নৈতিক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমারদের নীতি সম্বন্ধীয় কার্য্যগুলিকে ভাল বা মন্দ না বলিয়া যৌক্তিক বা অযৌক্তিক, ন্যায্য বা অন্যায্য বলাই উচিত। কেন না যৌক্তিকতা অযৌক্তিতা নিরূপণ জ্ঞানপ্রসূত ভাব-প্রসূত নহে। যৌক্তিকতা জ্ঞানে অথবা মূল আদর্শের সহিত মিলাইয়া জানিতে পারা যায়। ভাবে (feeling) জানা যায় না। কার্য্যের যৌক্তিকতা যেমন আমরা আপনা হইতে বুঝি, তেমনি আবার ইহার যাথার্থ্য পরীক্ষার অন্যতম উপায় আছে। যাহা আমার নিকট ন্যায্য তাহা জনসমাজের নিকটও ন্যায্য। যাহা আমার নিকট হেয় তাহা সকলেরই নিকট হেয়। রাজা অন্যায্য কর্ম্মের জন্য দণ্ড-বিধান করেন ; জনসমাজ তাদৃশ কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে। তবে অন্যায্য কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারতম্য আছে। যাহা বিশেষ হানিজনক তাহার জন্য রাজদণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে, যাহা সমাজের পক্ষে তাদৃশ ভয়াবহ নহে তাহাই ঘৃণার কটাক্ষে পরিলক্ষিত হয়।

নীতিশিক্ষা ও হিতাহিত জ্ঞান-শক্তির শিক্ষা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ, হিতাহিত জ্ঞান শক্তি আশৈশব মনুষ্যে রহিয়াছে। নীতিশিক্ষা অর্থে নীতির মূল মন্ত্রগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা বুঝায়, ইহাই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। নীচ প্রকৃতি গুলিকে দমন করিয়া উহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানের অধীনে আনয়ন করা। হিতাহিত বিবেচনা অর্থে আদর্শের সহিত বিশেষ কার্য্য বা অভিপ্রায় মিলাইয়া দেখা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। মনুষ্য নানা প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির মিলন ক্ষেত্র ইহা স্বর্গ ও নরকের একাধার। সুপ্রবৃত্তি আমাদিগকে এক পদ অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছে, আবার দুষ্প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ শত পদ পশ্চাতে লইয়া যাইবার অবসর অন্বেষণ করিতেছে। মনুষ্যের মন দেবাসুরের যুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে। মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যই এরূপ বিভিন্নমুখী ক্ষমতার ফল। সুপ্রবৃত্তি দ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে পারিলে মনুষ্য

আপনার দেবভাবে পরিচালিত হইতে পারেন। দুষ্প্রবৃত্তি সকল যদি আমারদের উপর প্রভুত্ব খাটাইতে না পারিত তবেইত হিতাহিত জ্ঞানের রাজত্ব অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। সেই জন্য মনুষ্য একরূপ বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তির কুচক্রে অন্যরূপ করিয়া বসে।

হিতাহিত-জ্ঞান ও হিতাহিত বিবেচনা এই দুই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যাহা প্রকৃতরূপে ন্যায্য কেহই তাহাকে অন্যায়ের শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন না। বরং লোকের মধ্যে কোনটি ন্যায় তাহা অপেক্ষা কোনটি অন্যায় তাহা লইয়া বহুল পরিমাণে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্য প্রবঞ্চনাকে ক্ষমা করিতে পারে কিন্তু ন্যায়-পরতাকে ঘৃণা করিতে পারে না! নিষ্ঠুর প্রতিশোধকে প্রশংসা করিতে পারে কিন্তু ক্ষমা ও মহত্ত্বকে তাহা অপেক্ষা অধিক আদরের সামগ্রী মনে করে। নীতির মূল সত্যে মনুষ্যের মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু কার্য্যে তাহার প্রয়োগের বিভিন্নতা আছে। তাহার কারণ এক প্রকার পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে মনুষ্যের অন্তরে এরূপ কয়েকটি দুষ্প্রবৃত্তি আছে যাহারা হিতাহিত জ্ঞানের সহিত সৌহার্দ্দে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে। স্বার্থপরতা, হিংসা ইহাদের অগ্রণী। ইহারা মনুষ্যকে ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আনয়ন করে। পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল, যাঁহারা হৃদয়তন্ত্রী গুলিকে হিতাহিত জ্ঞানানুমত করিয়া বাঁধিয়া লইতে পারেন। আবার নীতির মূল মন্ত্র সম্বন্ধে মতদ্বৈধ না থাকিলেও বর্ত্তমানে আমার কর্ত্তব্য কি তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। যেমন কোন বলিষ্ঠ ভিক্ষুক ভিক্ষার্থ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে আমরা কখন বা তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করি, কখন বা আলস্যের আশ্রয় দান বিবেচনায় তাহাকে শূন্যহস্তে ফিরাইয়া দিই অথচ দানকে ঘৃণা করি না।

আমারদের এমন দুর্ব্বলতা আছে, যাহা আমাদিগকে সহিষ্ণুভাবে বিবেচনা করিতে দেয় না, বিশেষ বিবেচনার পূর্ব্বেই আমরা আপনা হইতে একদিকে নীয়মান হই। এ ভ্রম কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন। স্বাধীন ভাবে যুক্তি অবলম্বন না করিয়া ভ্রমে পতিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সমাজের মধ্যে যে সকল ভ্রম ও কুসংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আপনাপন যুক্তি তর্ক সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অমূলক বিশ্বাস আমারদের হৃদয়কে এরূপ বিমোহিত করিয়া রাখে যে তাহার কোন সারবত্তা না থাকিলেও আমরা সহজে তাহাদিগকে বিদায় দিতে পারি না। পূর্ব্বে যখন নরবলি প্রচলিত ছিল তখন যদি সেই দুর্ভাগ্য নর দেবতার সম্মুখে ঘাতকের হস্ত হইতে কোনরূপে পলায়ন করিতে পারিত, তবে ঘাতক পূজক ও দর্শকবৃন্দের ক্ষোভের সীমা থাকিত না। বর্ত্তমানেও ঈদৃশ অযথা অসত্য হাস্যাস্পদ ধর্ম্মবিশ্বাসের অপ্রাচুর্য্য নাই।

এই সকল কারণে নীতির মূলসত্যে ও আচরণে এত প্রভেদ ও হিতাহিত জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে এতদূর সন্দেহ। দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন ভিন্ন সুনীতির অপরাজিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন না মনুষ্যগণ একমাত্র হিতাহিত জ্ঞানের আদেশে পরিচালিত হইতে শিক্ষা করিবে ততদিন শান্তির রাজ্য সংস্থাপনের কালবিলম্ব হইবে। মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান-বিশিষ্ট জীব—

মনুষ্যের কার্য্যই কেবল হিতাহিত বিবেচনার ফল। মনুষ্য যতদূর স্বাধীন জীব ততদূর তাহার দায়ীত্ব আছে। যতদূর তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে সে প্রাণীজগতের রাজা। কার্য্যাকার্য্যের উপর তাহার স্বাধীনতা না থাকিলে হিতাহিত জ্ঞান একথা আসিত না। ইতর প্রাণীরা আহার বিহার লইয়া ব্যতিব্যস্ত এবং উহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অধীন। কিন্তু ব্যক্তিগত কার্য্য জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রসূত। নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিগত কার্য্য লইয়া আলোচনা করে। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহার নীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইলেও ইহা পশু পক্ষীর প্রতি সঙ্গত ব্যবহারের প্রতি উদাসীন নহে। বরং ক্রমশঃ এই বিষয় লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে।

আমরা মর্ত্ত্যের জীব। পদে পদে আমারদের বাধা পদে পদে বিঘ্ন। চারিদিকে আমারদের শত্রু। অন্তরে শত্রুদল বাহিরে শত্রুদল আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। সংসার পথের প্রতি পদবিক্ষেপে আমারদের বিপদের সম্ভাবনা। এরূপ ভয়ানক অবস্থায় পতিত হইয়া কি আমরা কোন ধ্রুবতারার উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইব না? অবস্থার দাস হইয়া কি রসাতলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব? আমারদের কি এখানে কোন সঙ্গী নাই, কোন হৃদয়বন্ধু নাই, যিনি বিপদের কাণ্ডারী হইয়া এই প্রবল তরঙ্গের মধ্যে মন-তরির হাল ধরিতে পারেন? যিনি কর্ত্তব্য পথে ন্যায় পথে আমাদিগকে বিচরণ করিবার উপদেশ দেন? ঐ যে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কে আমাদিগের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া আমাদিগকে সচকিত করেন? কে ন্যায় অন্যায়ের তৌলদণ্ড আমারদের সম্মুখে ধারণ করিয়া কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিতেছেন? কে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়া নির্জ্জীব হৃদয়ে উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছেন? আমরা যেন এমন ইষ্টদাতা সদ্‌গুরুর পরামর্শ অবহেলা করিয়া উদ্দাম ভাবে সংসারে বিচরণ না করি। সকল অবস্থাতে সকল বিষয়ে সকল কার্য্যে এমন হিতৈষী বন্ধুর আদেশ পালনে দৃঢ়ব্রত হই। নীচ প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া একমাত্র হিতাহিত জ্ঞানের পরিচালনায় আপনাকে স্থাপন করি। অতুল প্রভাব নরপতি যেমন আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া দূরস্থ প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তেমনই সকল জগতের রাজা মনুষ্যদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানকে অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়া সকলকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা ন্যায়ের রাজ্যে পদচারণা করিতে গিয়া যেন সেই ন্যায়রাজ্যের রাজাকে বিস্মৃত না হই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ন্যায় স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে। ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিলে ন্যায়ের অর্থ থাকে। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

জগতের কর্ত্তাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে প্রীতি করিবার বিভিন্ন পথ থাকিলেও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই! পৃথিবীতে নানা প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত থাকিলেও তাঁহার অনুমোদিত প্রিয়কার্য্য সম্পাদন লইয়াই মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে এবং এই প্রিয়কার্য্য লইয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা পরস্পরকে প্রীতির আহ্বানে সম্ভাষণ করিতে

পারেন, প্রীতির বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করিতে পারেন, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন নীতি পথে পদচারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥১০॥

কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয়, একাকী জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানাভ্যন্তরে যাহাই কেন অবস্থিতি করুক না, তাহারই মধ্যে এমন একটি অবয়ব বর্ত্তমান থাকা চাই যাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কোন-ক্রমেই স্থান পাইতে পারে না। ইন্দ্রিয় স্বতঃ (অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন-কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে) কোন জ্ঞেয় বিষয়কে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় —অর্থের নহে—কেবল অনর্থেরই গ্রহণ-কর্ত্তা। যাহা অর্থ-শূন্য এবং স্ববিরোধী—ইন্দ্রিয় কেবল তাহাই আনিয়া জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করে।

প্রমাণ।

জ্ঞানের বিষয় যাহাই হউক না কেন —অহম্পদার্থ তাহারই একতম অবয়ব (সিদ্ধান্ত ॥১॥২॥৬॥ দেখ); কিন্তু অহম্পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে; অথবা যাহা একই কথা—অহম্পদার্থ ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া—উপলব্ধি-গম্য নহে (৮ সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রমাণের গোড়া বাঁধুনি ॥ ১ ॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য যদিচ ইহার পূর্ব্বে উচ্চ অঙ্গের দার্শনিকদিগের মনে অস্ফুট-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, এমন কি তাহা লইয়া তাঁহারা বিরোধী পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পর্য্যন্ত পারৎপক্ষে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই উহার প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। উহা প্রমাণ করিতে হইলে অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি তত্ত্বের সংস্থাপন দ্বারা প্রমাণের গোড়া বাঁধুনি করা চাই;—প্রথমে এইটি সংস্থাপন করা চাই যে, যাবতীয় ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সঙ্গে সঙ্গে অনন্য একই কোন বস্তু, অথবা যাহা আরো ঠিক—অনন্য একই কোন জ্ঞানের অবয়ব, জ্ঞাত হাওয়া চাই; তাহার পরে এইটি দেখানো চাই যে, সেই যে অনন্য একই অবয়ব তাহা ভৌতিক বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারে না। বর্ত্তমান স্থলে এই দুইটি তত্ত্বের অবলম্বন ব্যতিরেকে প্রমাণ এক পদও চলিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের সেই অনন্য একই অবয়বটি যে কি—একাল পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক তন্ত্রই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলে নাই; এ তো দূরের কথা—জ্ঞানের ওরূপ একটি ধ্রুব অবয়ব যে, আছে, এ বিষয়েও কেহ কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; এরূপ যখন—তখন জ্ঞানের সেই ধ্রুব অবয়বটি যে, ভৌতিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে, এ তো আরো দূরের কথা—এ কথাটির প্রমাণ পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রের নিকট হইতে প্রত্যাশা করাই ভুল। বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রমাণের যে দুইটি অলঙ্ঘনীয় সোপান-পংক্তি আমরা উপরে প্রদর্শন করিলাম, তাহা পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রেই নাই; পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যে, উল্লেখ মাত্রও নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না—তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ থাকিতে পারে—কিন্তু ঐ দুইটি অলঙ্ঘনীয় সোপান পংক্তি বিরহে প্রমাণের যে, বিন্দু-বিসর্গও তথায় থাকিতে পারে না, ইহা দেখিতেই

পাওয়া যাইতেছে। আবার, প্রমাণের ঐ দুইটি সোপান-পংক্তির একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি কোন কার্য্যেরই নহে; প্রমাণের পক্ষে দুইটিই সমান অপরিহার্য্য। মনে কর যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইলাম যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-মাত্রেরই সঙ্গে আত্মাকে জানা চাই; কিন্তু আত্মা নিজেই যদি ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া—জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য হয়, তবে এ কথার কোন আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না যে, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তেমনি আবার মনে কর যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইলাম যে, আত্মা ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; কিন্তু তাহার সঙ্গে এটাও যদি না সত্য হয় যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলের সঙ্গে আত্মাকে না জানিলেই নয়—তাহা হইলেও এ কথার কোন অর্থ থাকে না যে, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু ঐ দুইটি অধিকরণই (অর্থাৎ প্রমাণের অলঙ্ঘনীয় সোপান-পংক্তি premise) আমাদের এখানকার ধ্রুব সিদ্ধান্ত —এখানে দুইটিই রীতি-মত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ধ্রুব-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে; এ-জন্যই বলি যে, দুয়ে মিলিয়া বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের একটি অকাট্য প্রমাণ—তদ্ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ নাই।

দশম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

"শুদ্ধ কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে—তদ্ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। যাহা কোন-না-কোন সময়ে ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাহাই কেবল জ্ঞানের অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে। একা কেবল ইন্দ্রিয়ই জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞানাভ্যন্তরে উপস্থিত করিতে পারে।" আমাদের চিরাভ্যস্ত আপামর-সাধারণ-সুলভ অশাস্ত্রীয় চিন্তার সহিত এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির খুবই মিল খায়।

লাইব্‌নিট্‌জের প্রতিষেধ-বাক্য ॥ ৩ ॥

লক্ নামক দর্শন-কারের একটি প্রসিদ্ধ বচন এই যে, "পূর্ব্বে যাহা ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে ছিল না—এরূপ কোন কিছুই জ্ঞানের অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না।" তাহার প্রত্যুত্তরে লাইব্‌নিট্‌জ্ বলিলেন—"জ্ঞান আপনি ব্যতীত" অর্থাৎ জ্ঞান নিজে ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। লাইব্‌নিট্‌জের এই কথাটির টীকা আবশ্যক। লাইব্‌নিট্‌জ্ যদি আমাদের ন্যায় বলিতেন যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সকলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আপনাকে আপনি জানিতেই চায়, আর যদি তিনি দেখাইতেন যে, জ্ঞান আপনাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, তবে তাহার উপর আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারিত না—হয় তো তাহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়; কিন্তু বাস্তবিকই যদি তাহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় হয়, তবে তাঁহার ভিতরের ভাবটি যেমন—তাঁহার কথাটি তাহার ঠিক্ উপযুক্ত হয় নাই। তিনি কেবল বলিতেছেন যে, জ্ঞান আপনি ভিন্ন আর-কোন-কিছুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ না হইয়া জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। এ কথাটিতে কিছু আর এরূপ বুঝায় না যে, জ্ঞান আপনাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, আর, এমনও বুঝায় না যে, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় একাকী জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। "জ্ঞান আপনার অভ্যন্তরে আপনি আছে" শুদ্ধ এই কথাটিতেই আমাদের

আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না; তাহার সম্বন্ধে আরো এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞান আপনার অভ্যন্তরে আপনি জ্ঞাত-সারে আছে কি অজ্ঞাত-সারে আছে? যদি বল যে, কখন বা জ্ঞাতসারে আছে—কখনও বা অজ্ঞাত-সারে আছে; তবে তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, বাহ্য-বস্তু-বিশেষ যখন আমার জ্ঞাত-সারে আমার জ্ঞানাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে তখন আমি আমার অজ্ঞাত-সারে আমার জ্ঞানাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছি—এরূপ হইবারও কোন বাধা নাই; এক কথায়—আপনাকে না জানিয়াও বাহ্য বস্তুকে জানিতে পারিবার কোন বাধা নাই; লাইব্‌নিট্‌জের কথার ফল তবে আর কি হইল?

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের আকার সম্বন্ধে টীকা ॥ ৪॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি সচরাচর যে আকারে প্রদর্শিত হয় তাহার ভাষা বড়ই গোলমেলে। আমরা উহাকে যেরূপ তীব্র আকারে প্রদর্শন করিয়াছি—তাহা আমরা বুঝিয়া সুঝিয়াই করিয়াছি; পাছে অর্থের কোন ইতস্ততঃ হয়—এ জন্যই আমরা তাহা করিয়াছি। আমাদের কথার সঙ্গে এবং তাহার অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। পরে প্রকাশ পাইবে যে, প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি এখানে যে আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহা আগা গোড়া সুসঙ্গত; কিন্তু সচরাচর তাহা যে আকারে প্রদর্শিত হয় তাহার আগা'র সহিত গোড়া'র মিল নাই। এ যাবৎকাল প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির তীব্রতা ঘুচাইয়া তাহাকে শোধন করিবার যত প্রকার চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে, তাহাতে লাভের মধ্যে কেবল—এক গুণ গোলমালকে দশ-গুণ করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সিদ্ধন্তটিকে কতক-মতক সংশোধন করিয়া তাহাকে দোষ-মুক্ত করিবার কোন উপায় নাই—তাহাকে সমূলে নিপাত করা আবশ্যক; আর, তাহা যদি করিতে হয় তবে বর্ত্তমান দশম সিদ্ধান্তই তাহার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি শোধিত এবং অশোধিত দুই অবস্থাতেই স্ববিরোধী ॥ ৫॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম শুদ্ধ কেবল তাহার এই কথাটিতেই আবদ্ধ নহে যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান; তদ্ব্যতীত, তাহার এ কথাটিও ভ্রমাত্মক যে, আমাদের একটিও-কোন জ্ঞান কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত কথাটি যেমন অসত্য এবং স্ববিরোধী, শেষোক্ত কথাটিও তেমনি অসত্য এবং স্ববিরোধী। কেন না এটি এখানকার স্থির-সিদ্ধান্ত যে, আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানেই এমন একটি উপাদান বর্ত্তমান থাকা চাই যাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আসিতে পারে না—কি? না অহম্পদার্থ। অতএব প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণই হউক্ আর সঙ্কীর্ণই হউক্—উভয়-স্থলেই তাহা স্ববিরোধী;—সমস্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে যদি তাহাকে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও তাহা স্ববিরোধী, আর, বিশেষ কোন-জাতীয় জ্ঞানের সম্বন্ধে যদি তাহাকে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও তাহা স্ববিরোধী।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিই ইন্দ্রিয়-বাদের বীজ-মন্ত্র ॥৬॥

এই যে একটি কথা যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার না মাড়াইয়া কোন কিছুই জ্ঞানাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাই ইন্দ্রিয়-বাদের বীজ-মন্ত্র। "ইন্দ্রিয়-বাদ" এ শব্দটি প্রয়োগ করাতে ইন্দ্রিয়-বাদীর উপরে প্রকারান্তরে এরূপ দোষারোপ করা হইতেছে না যে, ইন্দ্রিয়-বাদী অন্যান্য ব্যক্তি

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়াসক্ত; "ইন্দ্রিয়-বাদী" বলিতে শুদ্ধ কেবল এই পর্য্যন্তই বুঝায় যে, তাঁহার মতানুসারে মনুষ্যের সমস্ত জ্ঞানই আপাদ মস্তক ইন্দ্রিয়-মূলক। ইন্দ্রিয়-বাদীরা কখনো কখনো এই একটি অসাধারণ গুণের জন্য আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করেন— এবং লোকের নিকটেও প্রতিপত্তি লাভ করেন যে, দার্শনিকদিগের মধ্যে তাঁহারাই কেবল পরীক্ষা-লব্ধ সত্যের উপরে জ্ঞানের মূল-পত্তন করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে,সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাই তাহাই করেন ; তবে যদি কাণ্ট্‌কে ব্যতিরিক্তের কোটায় গণ্য করা যায়—সেই যা এক। কাণ্টের মতানুসারে, এক জাতীয় জ্ঞান বাহির হইতে আসিতেছে এবং আর-এক জাতীয় জ্ঞান ভিতর হইতে আসিতেছে ; আর, এই দুই জাতীয় জ্ঞানের ভেদ নিরূপণ করিতে গিয়া কাণ্ট পূর্ব্বোক্তকেই (বহির্ম্মূলক জ্ঞানকেই) কেবল পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান (experience) বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষা শব্দের এরূপ অর্থ-সংকোচ নিতান্তই স্বকপোল-কল্পিত ও অযৌক্তিক। যদি আমাদের মনোমধ্যে বাস্তবিকই কোন-প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান থাকে, তবে অবশ্য তাহার স্বতঃসিদ্ধতা আমরা পরীক্ষাতেই উপলব্ধি করি—তাহা কিছু-আর আমরা গায়ের জোরে মানিয়া লই না। প্রকৃত কথা এই যে, কি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—কি পরতঃসিদ্ধ জ্ঞান—সকল জ্ঞানই পরীক্ষা-লব্ধ। জ্ঞানকেই পরীক্ষা বলে, আর, পরীক্ষাকেই জ্ঞান বলে। বস্তু যাহা—তাহা একই ; তবে কি না—তাহার একটি নাম "পরীক্ষা," আর-একটি নাম জ্ঞান, এই যা কেবল প্রভেদ। "সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষা-লব্ধ" এ কথার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে,সমস্ত জ্ঞানই জ্ঞান; এ তো ধরা কথা, ইহার উপরে আর কাহারো কোন বাদানুবাদ চলিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা যায় যে, সমস্ত জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা হইতে সমুদ্ভূত, তবে দাঁড়ায় এই যে, সমস্ত জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান,—এ কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এ কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়া গিয়াছে এবং এখনো চলিতেছে। এটি আমাদের প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তেরই কথা। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই—বর্ত্তমান দশম সিদ্ধান্ত উহাকে জ্ঞানের দুইটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী বলিয়া অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে—সুতরাং আর যে, কখনও উহা মাথা তুলিবে, সে পথ জন্মের মত বন্ধ হইয়া গেল।

অতীন্দ্রিয়-বাদী মনোবিজ্ঞান প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তি কমাইয়া দেয়—এই মাত্র, কিন্তু তাহার স্ববিরোধ অব্যাহত রাখিয়া দেয় ॥৭॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির বলবত্তার বিরুদ্ধে মনোবিজ্ঞান অনেক কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সমস্ত চেষ্টা শুদ্ধ কেবল ঐ সিদ্ধান্তটির ব্যাপ্তি-সংকোচেই নিয়োজিত হইয়াছে ; উহার ব্যাপ্তি—মনে কর যেন—অতীব সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল,তাহাতেই বা কি ? তাহাতে তো আর উহার স্ববিরোধিতা ঘুচে না ; কেন না ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, উহার ব্যাপক অর্থেও উহা যেমন স্ববিরোধী—উহার সঙ্কীর্ণ অর্থেও উহা তেমনি স্ববিরোধী ; আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কেবল মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান—ইহা যেমন স্ববিরোধী, আমাদের কোন কোন জ্ঞান কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান—ইহাও তেমনি স্ববিরোধী। মনোবিজ্ঞানের কৃত ব্যাপ্তি-সংকোচ এইরূপ, যথা ;—মনো-

বিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই যে, ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আসে, এ কথা সত্য নহে; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, বিশেষ এক জাতীয় জ্ঞান শুদ্ধ কেবল ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইঁহাদের অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ উক্ত "বিশেষ এক জাতীয় জ্ঞানের" আংশিক উপাদান—ইঁহাদের মতে ঐ-জাতীয় জ্ঞানের সর্ব্বাংশই ঐন্দ্রিয়ক উপাদানে পরিগঠিত। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির ব্যাপ্তিকে এইরূপে সীমাবদ্ধ করিলে কতক অংশে উহার প্রতিবাদ করা হয় বটে কিন্তু তেমনি আবার কতক অংশে উহাকে অনুমোদনও করা হয়; ইহাতে তাহার স্ববিরোধিতার তিলমাত্রও উপশম হয় না।

সকল রোগের মূল ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয় এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুব্যবস্থা এবং সুগতির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়; এখনকার দর্শনকারেরা সেই প্রভেদটিকে একেবারেই উড়াইয়া দে'ন—ইহাই সমস্ত রোগের মূল। তত্ত্ব-জ্ঞানক্ষেত্রে দ্বিতীয় এমন একটি গুরুতর প্রভেদ নিরূপিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই জন্য প্রভেদটির কালে কালে যেরূপ ভাল মন্দ গতি ঘটিয়াছে ও তাহাকে গোলে ফেলা'তে যেরূপ নানা প্রকার জটিল তর্কবিতর্কের তুমুল কোলাহল দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি ইতিবৃত্ত এখানকার স্থানোচিত; বিশেষত যখন—সমস্ত দার্শনিক টীকা ও ভাষ্যের মূল-সূত্র বাহির করিয়া দেখানো বর্ত্তমান সংহিতার প্রধান একটি সংকল্প।

গ্রীস্ দেশীয় দর্শনকারদিগের উদ্দেশ্য এবং তাহার সাধন প্রণালী ॥ ৯ ॥

ইতি পূর্ব্বে আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে, গ্রীস্ দেশীয় প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্র যে অংশে জ্ঞান-তত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত সে অংশে এইটি বুঝানোই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, অবিদ্যা কিরূপে বিদ্যাতে পরিণত হয়—অজ্ঞেয় কি প্রণালীতে জ্ঞেয়ত্ব প্রাপ্ত হয়—যাহা কোনক্রমেই বোধায়ত্ত হইবার নহে তাহা কিরূপ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া বোধগম্য পদবীতে সমুত্থান করে। এইজন্য যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগম্য—বুদ্ধির অতীত—তাহাই উক্ত দর্শন-শাস্ত্রের যাত্রারম্ভের প্রথম পঁইটা ছিল, তাহা কি? না অবিদ্যা—স্ববিরোধী অর্থ-শূন্য অবিদ্যা। এরূপ যদি মনে করা যায় যে, যাহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞেয় হইয়া বসিয়া আছে তাহা কিরূপে জ্ঞেয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ইহারই প্রণালী প্রদর্শন করা উক্ত দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, তবে নিতান্তই ভুল মনে করা হয়; কেননা, শুধু শুধু ওরূপ একটা বৃথা কর্ম্ম-ভোগে ব্যাপৃত হওয়া এখনকার কালেরই ধর্ম্ম। প্রাচীন-দর্শন-শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আর কিছু নয়—স্ববিরোধী কেমন করিয়া—অর্থাৎ কিরূপ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া—জ্ঞানের গম্য হয়, সংক্ষেপে—অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া তাহা কিরূপে বিদ্যাতে পরিণত হয়, এইটি বুঝানো; আর, তাহার কার্য্য-পদ্ধতি ছিল এইরূপ, যথা;—উক্ত দর্শন-শাস্ত্র বলে যে, ইন্দ্রিয় কেবল অবিদ্যারই গ্রহণ-কর্ত্তা—ইন্দ্রিয়ের অর্থই হ'চ্চে অনর্থ। অবিদ্যা, অর্থাৎ একটা স্ববিরোধী ব্যাপার, সহজ কথায়—একটা পাগ্‌লামি কাণ্ড। ইন্দ্রিয়—জ্ঞান-বহির্ভূত জড়-জগৎকে আঁকড়িয়া ধরে; এরূপ অঙ্গহীন জড়জগৎ একটা স্ববিরোধী অর্থ-শূন্য পাগ্‌লামি কাণ্ড বই আর কিছুই নহে—উহা কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-

গম্য নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সেই যে, অনর্থ-জগৎ—পাগলামি কাণ্ড—অবিদ্যা, তাহা কিরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত সত্যে—বিদ্যাতে—পরিণত হয়? প্রাচীন দর্শনকারেরা ইহার মীমাংসা এইরূপ করেন যে, জ্ঞান তাহার আপনার ভাণ্ডার হইতে অঙ্গহীন জড়-জগতের অভাব পূরণ করিয়া অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে; জ্ঞানের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য লাভ করিয়াই—জড়জগৎ অবিদ্যার নিশা হইতে বিদ্যার (অর্থাৎ সমীচীন জ্ঞানের) দিবালোকে সমুত্থান করে। কিন্তু যাহা দিয়া জ্ঞান অঙ্গহীন জড়জগতের অঙ্গ-পূরণ করে তাহা যে, কি, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা তাহা স্থির করিয়া ওঠা তেমন সহজ পা'ন নাই।

ইতিহাস লেখকের অবলম্বনীয় একটি নিয়ম॥ ১০॥

দার্শনিক মতামতের ইতিহাসের আন্দোলন-কালে, সুস্পষ্ট এবং সন্তোষ-জনক ফল-লাভ করিবার এক যাহা উপায় তাহা এই;—প্রথমে, দর্শনকারের সমুদায় কথাগুলির মোট তাৎপর্য্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাই তাঁহার আয়ের কোটায় নিক্ষেপ করা, এবং তাহার পরে তাঁহার দ্ব্যর্থ-সূচক অস্পষ্ট উক্তি সকলকে ব্যয়ের কোটায় নিক্ষেপ করা। ফলে, প্রথমে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়টিকে এই-ভাবে দেখা উচিত যে, যেন তিনি তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন; এবং তাহার পরে তখন বিবেচ্য যে, বিভ্রান্তির গতিকে তিনি তাঁহার অভীষ্ট ফল-লাভে কতদূর বঞ্চিত হইয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রের সুবিচার-সঙ্গত ইতিহাস লিখিতে হইলে এইরূপ প্রণালীর অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেননা, দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্যমে তাহা অতীব অপক্ক এবং অস্পষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ হইবারই কথা; কাজেই, শুদ্ধ কেবল তাহা দৃষ্টে দর্শন-কারের প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা অসম্ভব। দার্শনিক মতামতের ইতিহাস-লেখকেরা সচরাচর যেরূপ অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থসূচক মত-সকলকে তথৈব অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থসূচক বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন তাহাতে কোন ফলই দর্শে না।

বর্ত্তমান সংহিতায় এই প্রণালীটি অবলম্বিত হইয়াছে॥ ১১॥

এটুকু যখন আমরা বুঝিয়াছি, তখন আমাদের কর্ত্তব্য এখন এই যে, এখানকার আলোচ্য দার্শনিক মতটিকে আমরা অতীব সুস্পষ্ট আকারে প্রদর্শন করি, আর, আপাতত এইরূপ মনে করি—যেন সেইরূপ আকারেই তাহা গ্রীস্ দেশীয় প্রাচীন দার্শনিকদিগের লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছিল; কেননা, ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ মতটি বাস্তবিকই তাঁহাদেরই মত—তবে কি না—উহাতে তাঁহারা স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দ্ব্যর্থ-ভাব এবং সেই দ্ব্যর্থ-ভাবের ফল যাহা পরপরবর্ত্তী দার্শনিক আলোচনা-ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ফলিত হইয়াছে, তাহা যখন আমরা বাহির করিয়া দেখাইব, তখন কোন্ বিষয়ে উঁহাদের ন্যূনতা ছিল তাহা ধরা পড়িতে বাকি থাকিবে না।

ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের প্রভেদের ইতিহাসে প্রত্যাবর্ত্তন॥ ১২॥

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা প্রভেদের পরাকাষ্ঠা। এ নহে যে,

তাঁহারা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান এ দুইটি ব্যাপারকে অন্তঃকরণের দুইটি সহোদর বৃত্তি ঠাহরিয়াছিলেন; তাঁহাদের অবধারিত প্রভেদ আরো ব্যাপক এবং তল-স্পর্শী। বরং তাঁহারা ও দুইটি ব্যাপারকে একই মনোবৃত্তির দুইটি বিপরীত পৃষ্ঠ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় অবিদ্যাকে ধরিয়া আনিয়া জ্ঞানের সমক্ষে উপস্থিত করে, আর, জ্ঞান সেই অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে। ঐন্দ্রিয়ক উপাদান-গুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান-কর্তৃক শোধিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে-গুলি অবিদ্যাবস্থায় (অর্থাৎ স্ববিরোধী অবস্থায়) বর্ত্তমান থাকে। সে অবস্থায় সে-গুলি একান্ত পক্ষেই জ্ঞানের অগম্য। পরে যখন জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়া আপনার ভিতর হইতে আর-একটি উপাদান বাহির করিয়া সে-গুলির গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেয় তখনই সে-গুলি জ্ঞানের গম্য হয়। এই অতিরিক্ত উপাদানটির সাহায্যেই জ্ঞানের বিষয়-সকল জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রদত্ত অবিদ্যা-উপাদান, এবং জ্ঞানের প্রদত্ত অতিরিক্ত আর-একটি উপাদান, এ দুই উপাদান এক সঙ্গে জানার গতিকেই জ্ঞান আপনার বিষয়-রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই প্রণালী অনুসারেই ইন্দ্রিয়ের স্ববিরোধী বস্তু-সকল জ্ঞানের বিজ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত হয়; এই প্রণালীটির কার্য্য যতক্ষণ না পরিসমাপ্তি হয় ততক্ষণ তাহা জ্ঞানে ধরা পড়ে না বটে—কিন্তু পরে তাহা দার্শনিক চিন্তাতে সুব্যক্ত আকারে প্রতিভাত হয়। মনুষ্যের জ্ঞান-সমক্ষে জড়জগতের যেরূপ চাঁচা-চোঁচা পরিষ্কার মূর্ত্তি সুপরিস্ফুট হয়, তাহা ঐ প্রণালী-অনুসারেই হইয়া থাকে। জড়জগৎ যে অংশে জ্ঞানগম্য এবং ধ্যান-গম্য সে অংশে তাহাতে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নাই, কেবল যে অংশে তাহা জ্ঞানের অগম্য এবং স্ববিরোধী সেই অংশেই ইন্দ্রিয় তাহা লইয়া ব্যাপৃত হয়। এইটিই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম-নিহিত অভিপ্রায় ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জ্ঞানের যাহা কার্য্য তাহা জ্ঞানই করিতে পারে—ইন্দ্রিয় তাহা কোন অংশেই পারে না; ইন্দ্রিয় নিছক স্ববিরোধী ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকে। কাজেই—স্ববিরোধিতার ভঞ্জন-কার্য্যেও ইন্দ্রিয়ের কোন হস্ত নাই, আর, স্ববিরোধিতা অপগত হইলেও বিরোধ-মুক্ত বিষয়ের উপলব্ধি কার্য্যেও তাহার কোন হস্ত নাই! স্ববিরোধী বিষয়-সকলকে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করাই ইন্দ্রিয়ের একমাত্র কার্য্য; আর, তাহা জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হইলেও জ্ঞান যতক্ষণ না আপনাকে তাহার সঙ্গে একত্র উপলব্ধি করে ততক্ষণ তাহার বিরোধ-ভঞ্জন হয় না সুতরাং ততক্ষণ তাহা জ্ঞানের উপলব্ধি-যোগ্য হয় না।

প্রাচীন মত-সম্বন্ধে একটি উপমা ॥ ১৩ ॥

এখানকার এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তাহা নিম্ন-লিখিত উপমা-দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে;—মনে কর যেন স্ববিরোধী অবিদ্যা কিছু-না অপেক্ষা (০ অপেক্ষা) অধিক, কিন্তু একটা-না-একটা কিছু অপেক্ষা (১ অপেক্ষা) কম। কিন্তু সেই যে অবিদ্যা—যাহা শূন্যও নয়, একও নয়, তাহা কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে; কেননা জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি-গম্য, হয়—তাহা একটা-না-একটা কিছু, (যেমন আলোক); নয়—তাহা একটা-না-একটা কিছুর অভাব (যেমন অন্ধকার—নিঃস্তব্ধতা ইত্যাদি), সাঙ্কেতিক ভাষায়—হয় তাহা ১, নয় তাহা ০, ইহার অন্যথায় কোন-কিছুই জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে